Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম তাবাচ্ছুম

রোলঃ 23100120373

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুষঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম তাবাচ্ছুম

রোলঃ 23100120373

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্র " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসনিম তাবাচ্ছুম, আইডিঃ 23100120373 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্র " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Tasnim Tabassum

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

তাসনিম তাবাচ্ছুম

আইডিঃ 23100120373

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রাককথন: 6

ভূমিকা: 8

গবেষণার পটভূমি: 10

সমস্যার বিবৃতি: 10

গবেষণার উদ্দেশ্য: 11

তাওহীদ ভিত্তিক মূল তত্ত্ব: 12

শির্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: 14

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি: 17

গণতন্ত্রের বুৎপত্তি: 19

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা: 20

ইসলামী শাসনব্যবস্থা: 23

ইসলামে শাসক / খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি : 26

গণতন্ত্রের শাসক নির্বাচনের পদ্ধতি 29

প্রচলিত ভোট ব্যবস্থা ও ইসলামী শূরা: 32

গণতন্ত্রের আকিদা বনাম ইসলামী আকিদা: 36

গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম: তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ 37

গণতন্ত্র কেন কুফরি ব্যবস্থা: 40

গণতন্ত্রের শরীয় হুকুম 45

ইসলাম ও গণতন্ত্র: 55

গণতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার প্রচেষ্টা : 58

গণতন্ত্রের অপর নাম ধোকাতন্ত্র : 64

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের বিধান : 74

খিলাফাতের বিলুপ্তি : 77

ইসলামী শাসন/ খিলাফত ব্যবস্থা হারিয়ে মুসলমানদের অবস্থা : 81

বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট: 85

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট : 88

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা : 91

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অসারতা ও প্রায়োগিক বাস্তবতা: 99

উম্মাহর লাঞ্ছনার কারণ ও মুক্তির উপায় 117

পরিশেষে 118

তথ্যসুত্র: 120

প্রাককথন:

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এক ও অদ্বিতীয় এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রেরিত বান্দা ও রাসূল।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি, আমাকে মুসলিমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং পথপ্রদর্শনের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দিয়েছেন। হিদায়াত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে দেওয়া এক অপূর্ব নিয়ামত। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত দান করার কেউ নেই। আমরা তো রবের দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।

শুকরিয়া সেই মহান রব্বুল আলামীনের,যিনি আমাকে **"ইসলাম ও গণতন্ত্র"** এই শিরোনামের বিষয়টির উপর গবেষণা করার জন্য মনোনীত করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

অসংখ্য দরুদ ও সালাম প্রেরিত হোক আমার সর্দার সায়্যিদিনা মুহাম্মদ মোস্তফা হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলাম কে পূর্ণতা দান করেছেন।

সকল মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো জীবন ব্যবস্থা। বিভিন্ন দর্শন ও মতবাদের আলোকে এই জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও উৎস নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন অশেষ দয়াময়,যিনি নিজেই আমাদের জন্য মনোনীত সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে উক্ত শিরোনামের দিকে এগোলে সর্বপ্রথমে যে বিষয় চক্ষুগোচর হয় তাহলে, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাতায়ালা কুরআনুল কারীমে একাধিক আয়াতে বারংবার এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন

পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে এবং নিষেধ করেছেন অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করতে।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-
98/364

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম।"

সুতরাং কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত দ্বীনে কোন কিছুতে সংযোজন, বিয়োজন, কিংবা পরিবর্ধন, পরিবর্তন করার।

এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো **কুরআন ও হাদিসের আলোকে "ইসলাম ও গণতন্ত্র"** বিশ্লেষণ করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই প্রবন্ধটি মুফিদ ও মাকবুল করুন; সর্বপ্রথম আমাকে এর ওপর আমল করায় তাওফিক দিন এবং যারা পড়বেন তাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হবার ও আমল করবার তাওফিক দিন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার সাথে জড়িত উস্তায-উস্তাযা এবং উক্ত গবেষণার সাথে জড়িত সকল মানুষের প্রতি যাদের উসিলায় রব আমাকে এই কাজে আঞ্জাম দেওয়ার তাওফিক দান করলেন। আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'য়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকলকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

ভূমিকা:

মানবজীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগকে সুশৃঙ্খল, ন্যায়নিষ্ঠ এবং সঠিক নির্দেশনার আলোকে জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। মানবজাতির ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষা থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সামষ্টিক শাসনপদ্ধতি সবকিছুরই এক অনপনেয় ও নিখুঁত রূপরেখা শরিয়তের বিধানে বিদ্যমান। রাষ্ট্র পরিচালনা, শাসনপদ্ধতি এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় ও অলঙ্ঘনীয় নীতিমালা, যা কোনো যুগে বা কোনো ভূখণ্ডের মানুষের খেয়ালখুশি কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তনযোগ্য নয়।

সমসাময়িক বিশ্বে পশ্চিমা রাষ্ট্রদর্শন, বস্তুবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা ও আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় গণতন্ত্রকে একটি পরম আদর্শ, প্রগতিশীল এবং সর্বজনীন শাসনব্যবস্থা হিসেবে পুরো বিশ্বের কাছে জোরপূর্বক উপস্থাপন করা হলেও, বিশুদ্ধ ইসলামিক আকীদা, ঈমান ও শারঈ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর অন্তর্নিহিত স্বরূপ ও বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম এবং গণতন্ত্র; এ দুটি ব্যবস্থা কেবল বাহ্যিকভাবে পৃথক নয়, বরং তা আদর্শিক ভিত্তি, গাঠনিক কাঠামো এবং ঈমান ও বিশ্বাসের মৌলিক স্তম্ভের দিক থেকে একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মেরুতে অবস্থান করে। একটির ভিত্তি যেখানে মহান রবের প্রদত্ত শারীয়া, অপরটির ভিত্তি সেখানে মানুষের সীমিত বুদ্ধি, বস্তুবাদী দর্শন ও প্রবৃত্তির দাসত্ব।

গণতন্ত্রের সামগ্রিক কাঠামোটি গড়ে উঠেছে মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বেচ্ছাচারিতার ওপর ভিত্তি করে। ইসলাম যেখানে ঘোষণা করে যে, বিধান দেওয়ার একক অধিকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, সেখানে গণতন্ত্র দাবি করে আইন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মালিক হলো সাধারণ জনগণ বা তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, এই পশ্চিমা ব্যবস্থাকে কেবল একটি শাসনপদ্ধতি হিসেবে নয়, একটি বিশ্বজনীন সভ্যতা ও আদর্শ হিসেবে মুসলিম দেশগুলোর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বীনের একটি মাত্র প্রমাণিত ও সুনির্দিষ্ট বিধানকে স্বেচ্ছায় অস্বীকার বা অমান্য করলে যেখানে মানুষের ঈমান আর অবশিষ্ট থাকে না; সেখানে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে আল্লাহর আইনকে বর্জন করে মানুষের খেয়ালখুশিকে আইনের উৎস বানানো যে কত বড় আকিদাগত বিপর্যয়, তা বর্তমান উম্মাহর একটি বড় অংশ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এই মনস্তাত্ত্বিক ও আকিদাগত পরাস্ততার কারণে সমকালীন মুসলিম বিশ্বে এক চরম বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার এই বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের মুখে পড়ে অনেক মুসলিম, এমনকি বহু ইসলামি চিন্তাবিদ ও এই মরীচিকার পেছনে ছুটছেন।

শরিয়তের অকাট্য দলিলের আলোকে এটি স্পষ্ট যে, পশ্চিমা গণতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি ইসলামের তাওহীদি বিশ্বাসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। ইসলামে এই শাসনব্যবস্থা নিছক কোনো ত্রুটিপূর্ণ রাজনৈতিক মতবাদ নয়, এটি ইসলামের তাওহীদি রজ্জুকে ছিন্নকারী একটি স্পষ্ট কুফরি ব্যবস্থা, যা গ্রহণ, চর্চা ও সমর্থন করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বা হারাম।

গবেষণার পটভূমি:

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘকাল স্বকীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিলো, যার মূল চালিকাশক্তি ছিল রবের সার্বভৌমত্ব এবং আল্লাহর জমিনে তাঁরই দেওয়া সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানের বাস্তবায়ন। ইসলামের সোনালী যুগে খেলাফতের ছায়াতলে মুসলিম সমাজ, পুরো বিশ্বের কাছে এক অনন্য ও অপরাজেয় আদর্শিক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

কিন্তু পশ্চিমা ঔপনিবেশিক শক্তির অনুপ্রবেশ এবং মুসলিম রাষ্ট্রকাঠামোর পতনের পর, এ অঞ্চলের ওপর ধর্মনিরপেক্ষ শাসনদর্শন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটে এবং মুসলিম সমাজ এমন এক আমদানিকৃত ব্যবস্থার মুখোমুখি হয়, যা তাদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এই ঐতিহাসিক রূপান্তরই মূলত বর্তমান মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক ও আদর্শিক সংকটের মূল ভিত্তি তৈরি করেছে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই বক্ষ্যমাণ থিসিসটির অবতারণা করা হয়েছে।

সমস্যার বিবৃতি:

ইসলাম এসেছিলো এক নতুন উম্মাহর সূচনা করতে। মহান আল্লাহ সেই উম্মাহকে সমাসীন করেছিলেন বিশ্বমানবতার নেতৃত্বের মর্যাদাপূর্ণ আসনে। অজ্ঞানতা আর অন্ধকারের মরুপ্রান্তর থেকে মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল সেই উম্মাহ। কিন্তু চরম আক্ষেপের বিষয়, আজকের মুসলিম উম্মাহ তাদের সেই মহান দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে ভ্রান্ত পথে হেঁটে চলেছে।

নিজেদের অস্তিত্ব ও পরিচয় হারিয়ে তারা যেনো অন্য এক জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তারা ওইসব জাতির অনুকরণে ব্যস্ত হয়ে গেছে যারা নিজেরা বিভ্রান্ত, দিশেহারা এবং আপাদমস্তক আবর্জনায় নিমজ্জিত।

উম্মাহর এই চরম উদাসীনতা এবং গাফিলতির পুরোপুরি ফায়দা নিয়েছে পশ্চিমারা। তারা আমাদেরকে কেবল সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে পরাজিত করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং এই সুযোগে তারা অত্যান্ত সূক্ষ্মভাবে তাদের শিরকি ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসকে উম্মাহর শিরা উপশিরায় ঢুকিয়ে দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে। এবং এই বহিরাগতরা সফল ও বটে। তারা প্রতিষ্ঠা করেছে মানব রচিত শাসনব্যবস্থা।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

• ইসলামী শারীয়াহর মানদণ্ড অনুযায়ী গণতন্ত্র বিশ্লেষণ করা।

• ইসলামী শাসন ব্যবস্থার পর্যালোচনা।

• গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের চিন্তা দর্শন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অসারতা তুলে
ধরা।

• ইসলামের সাথে গণতন্ত্রের স্পষ্ট সাংঘর্ষিক অবস্থান প্রমাণ করা।

• উম্মাহর সাধারণ মানুষদের সামনে সহজেই গণতন্ত্রের ভয়াবহতা উপস্থাপন করা।

• কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের ফতোয়ার অকাট্য দলিলের আলোকে গণতন্ত্রের ইসলাম পরিপন্থী রূপটি উন্মোচন করা এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য এর আমূল নিষিদ্ধতার বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করা।

তাওহীদ ভিত্তিক মূল তত্ত্ব:

ইসলামে আকিদা বা বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ বা মহান আল্লাহর একত্ববাদ। যুগে যুগে দুনিয়ায় আগত সকল নবী-রাসূলগণের শিক্ষার মূল বিষয় ছিল তাওহীদ বা মহান আল্লাহর একত্ববাদে শিক্ষা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার একক সত্তার পরিচয় তুলে ধরে কুরআনুল কারিমে বলেছেন,

"বলুন, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তার মুখাপেক্ষী তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই"
(সূরা ইখলাস ১১২:১-৪)

একজন মুসলিমের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিকর্তা রিজিকদাতা নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কারো সামান্যতম উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই।

এ বিশ্বাসের কারণেই একজন মুসলিম কেবল আল্লাহরই ইবাদত করে, ভয় এবং আশা নিয়ে বিনম্র চিত্তে আন্তরিকভাবে মাথা নত করে। রবের সাথে বান্দার সম্পর্কের ভিত্তি হল বান্দার দাসত্ব বা পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ।

তাওহীদের প্রকারভেদ: তাওহীদকে মূলত তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

• **তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ** (সৃষ্টি ও পরিচালনায় একত্ব): আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, পালনকর্তা এবং বিশ্বজগতের পরিচালক এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা।

• **তাওহীদে উলুহিয়্যাহ** (ইবাদতে একত্ব): তাত্ত্বিকভাবে মেনে নেওয়া যে, একমাত্র আল্লাহই ইবাদত, উপাসনা, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভয়, ভালোবাসা এবং ভক্তির যোগ্য। অন্য কারো ইবাদত করা শিরক।

• **তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত** (নাম ও গুণে একত্ব): কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর যে নাম ও গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে কোনো রূপান্তর, ধরন বা উদাহরণ ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করা।

মূল বিষয়বস্তু:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সত্তাগতভাবে একক এবং গুণগতভাবেও একক। তাঁর কোনো সমকক্ষ, অংশীদার, স্ত্রী বা সন্তান নেই। তিনি মানুষের চিন্তাশক্তির ঊর্ধ্বে, অনাদি ও অনন্ত।

এই বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালা কেবল আকিদা নৈতিকতা ইবাদত ও আচার অনুষ্ঠানের মালিক নন বরং দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রেও তিনি এককভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত কোন শাসক নেই বিধানদাতা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা ব্যতীত কারো ক্ষমতা নেই দিকনির্দেশনা ও বিধান দেওয়ার।

একজন প্রকৃত মুমিন তার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে একমাত্র মহান আল্লাহর দ্বারস্থ হয়। ব্যক্তিগত আচার-আচরণ থেকে শুরু করে সমাজ সংস্কার, বিচার-শাসন, অর্থনীতি কিংবা রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে কেবল আল্লাহর বিধানের কাছেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।

সংক্ষেপে তাওহীদের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হলো:

• আল্লাহর একত্ববাদের দর্শনকে পরিপূর্ণভাবে বুঝে একক সত্তাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ইবাদত ও জীবনে তার প্রতিফলন ঘটানো।

• মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি

• নৈতিক জবাবদিহিতা তৈরি করা

• জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা

সর্বোপরি মহান রব্বুল আলামীন হলেন সর্বক্ষেত্রের এককভাবে চূড়ান্ত মালিক।

শির্কের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

আল্লাহ সুবহানাতায়ালা কুরআনুল কারীমে শির্ক সম্পর্কে বলেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغۡفِرُ اَنۡ يُّشۡرَكَ بِهٖ وَيَغۡفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِكَ "لِمَنۡ يَّشَآءُ ۚ وَمَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدِ افۡتَرٰۤي اِثۡمًا عَظِيۡمًا"

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।" (সুরা আন নিসা ৪:৪৮)

শিরকের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

'শিরক' (شرك) হলো তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা।

• শিরকের শাব্দিক অর্থ- অংশীদার করা সমকক্ষ মনে করা বা ভাগ করা।

• পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী বা ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে সমকক্ষ বা অংশীদার সাব্যস্ত করা।

শিরককে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. **আশ-শিরকুল আকবার** (বড় শিরক): এটি ঈমান থেকে সরাসরি বহিষ্কার করে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হিসাবে সাব্যস্ত করতে। উদাহরণ: মূর্তিপূজা, অন্য কারো জন্য মানত করা বা পশু যবাই করা।

২. **আশ-শিরকুল আসগার** (ছোট শিরক): এটি বাহ্যিকভাবে ইবাদত হলেও এতে লৌকিকতা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, যা তাওহীদের পূর্ণতাকে নষ্ট করে। উদাহরণ: লোক দেখানো ইবাদত বা রিয়া।

আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত,

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اجْتَنِبُوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: তোমরা ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। আর তা হলো আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করা ও যাদু করা"

শিরকের ক্ষেত্রসমূহ:

শিরক মূলত ৩টি ক্ষেত্রে হতে পারে।

• **রবুবিয়্যাহ-তে শিরক**: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্রষ্টা, পালনকর্তা বা রিজিকদাতা মনে করা।

• **উলুহিয়্যাহ-তে শিরক:** ইবাদত (নামাজ, দোয়া, মানত) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে করা।

• **নাম ও গুণাবলীতে শিরক:** মহান আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী (যেমন- অদৃশ্যের জ্ঞান) অন্য কোনো মানুষের বা সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান আছে বলে বিশ্বাস করা।

শিরকের ভয়াবহতা; অমার্জনীয় অপরাধ:

আল-মা'ইদাহ ৫:৭২

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ

"অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, 'নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ'। আর মাসীহ বলেছে, 'হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর'। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন, আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

বড় শিরক যা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, তা পরিপূর্ণ তাওবা না করলে আল্লাহ মাফ করবেন না। শিরক হচ্ছে আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নিয়ে সৃষ্টিকে দেওয়া, যা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ও অবিচার!

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি:

নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সত্য বলেছেন,

اَفَمَنْ يَّمْشِيْ مُكِبًّا عَلٰي وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓي اَمَّنْ يَّمْشِيْ سَوِيًّا عَلٰي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখের উপর ভর দিয়ে চলে সে কি অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে?" (আল-মুল্‌ক ৬৭:২২)

ইসলাম হলো মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরো মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা আল্লাহর নির্ধারিত একমাত্র চূড়ান্ত দ্বীন। যাতে পুরো মানবজাতির মধ্যে নেই ইনসাফ আদল ও মানবিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে ইসলামের শর্ত মেনে প্রত্যেকে বসবাস করতে পারে।

ইসলামের মাধ্যমে সব বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতির সংশোধন হয়েছে। ইসলাম এসেছে সব বিকৃতধর্ম, মিথ্যা বিশ্বাস,অনুমান-নির্ভর- দর্শন আর ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা দূর করার জন্য; সেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের আগে হোক বা পরে। এটি এমন এক সত্তার কাছ থেকে এসেছে যিনি যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। মানব জাতির চিন্তায় ও মনে যা কিছু প্রভাব ফেলেছে এবং ফেলবে তার কোন কিছুই যার অজানা নয়।

এজন্যই ইসলামে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তার সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক নিয়ে সঠিক আকিদার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্বাসগুলোর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকার পরই কেবল মানুষের বিবেক মজবুত ভিত্তি ও স্থিরতা পায়। মানুষের জীবনব্যবস্থা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ, আইন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক গুলো তখন পায় দৃঢ় এবং শক্ত ভিত্তি।

ইসলাম বিশেষভাবে মহান আল্লাহর ওই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে যেগুলো সৃষ্টি শাসন রিজিক রক্ষণাবেক্ষণ তাকদীর এবং মানুষের সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্কের সাথে জড়িত।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার ও রাহমাহ। কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের আকিদাগত কাঠামোর আলোকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ গুলো হলো:

১. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদ।

2. ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার প্রয়োগিক চূড়ান্ত ও বাস্তব রূপ হল রিসালাত। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রয়োগিক রূপ।

3. এই জীবন ব্যবস্থায় আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় সমাজে ইনসাফ ও নৈতিকতা টিকিয়ে রাখে।

4. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোন কিছুই আংশিকভাবে গ্রহণের কোন অবকাশ নেই। এটি ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা জীবন ব্যবস্থা।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল নির্যাস হলো এটি এমন এক জীবন ব্যবস্থা যা "তাওহীদের" ভিত্তিতে মানুষের চিন্তাকে আকিদাগত বিশুদ্ধতা দেয়, "রিসালাতের" মাধ্যমে কর্মের সঠিক দিকনির্দেশনা দেখায় এবং "আখিরাতের" মাধ্যমে মানুষকে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ করে একটি সুশৃঙ্খল ও ইনসাফপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বিনির্মাণ করে।

গণতন্ত্রের বুৎপত্তি:

গণতন্ত্রের আভিধানিক অর্থ:

গণতন্ত্রের ইংরেজি হলো Democracy, শব্দটি মূলত গ্রিকভাষায় Demos এবং kratía শব্দ দুটির সমন্বয়ে গঠিত। Demos অর্থ জনগণ আর kratía অর্থ শাসন। তাহলে Democracy এর অর্থ দাঁড়ায়, Rule of the people বা জনগণের শাসন।

গণতন্ত্রের পারিভাষিক অর্থ:

ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছ।

Democratic System of Government: A system of government based on the principle of majority dicision-making.

অর্থাৎ সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি: সংখ্যাগরিষ্ঠ মত গ্রহণের নীতির উপর ভিত্তি করে সরকার ব্যবস্থা।

আধুনিক গণতন্ত্রের রূপদাতা আমেরিকান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-

“Government of the people, by the people, for the people.”

অর্থাৎ 'জনগণের জন্যে জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার।

উইকিপিডিয়ায় গণতন্ত্রের বিবরণ দেওয়া হয়েছে-

'গণতন্ত্র বলতে কোনো জাতিরাষ্ট্রের, এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরির ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে।"

ব্যাখ্যা:

সুতরাং গণতন্ত্র বলতে, জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরি করে এবং তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌমিক ক্ষমতার মধ্যে আইন রচনা করে। এভাবে জনগণ নিজেদের ক্ষমতার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই নিজেদের পরিচালনা করে। গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে আইন প্রণয়ন এবং শাসক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার রয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা:

গণতন্ত্র হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা, যা মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস; অর্থাৎ এখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়।

কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

“জেনে রেখো, সৃষ্টি এবং বিধান প্রণয়নের সকল অধিকার একমাত্র তাঁরই।” (সূরা আরাফ, আয়াত নং ৫৪)

ব্যাখ্যা

• গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার দেওয়া বিধানাবলীর কোন জায়গা নেই। এক্ষেত্রে মানুষের সীমিত বিবেক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা যেটাকে কল্যাণকর মনে করে সেটা উপকারী আর যেটা ক্ষতিকর মনে করে সেটা ক্ষতিকর হিসেবেই গণ্য হয়।

• এমনকি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানও এই ব্যবস্থায় ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হয় না, যতক্ষণ না তা পার্লামেন্ট সদস্যদের দ্বারা অনুমোদিত হয়। নিঃসন্দেহে এটি এমন এক স্পষ্ট কুফরী, যা একজন মানুষকে ইসলামের গণ্ডি (মিল্লাতে ইসলাম) থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

• তাছাড়া, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যদি কোনো আইন ইসলামের অনুগামী করে তৈরিও করা হয়, তবুও তা 'আল্লাহর আইন' হওয়ার কারণে অনুসৃত হয় না; বরং তা কার্যকর হয় এজন্য যে, সংসদের সদস্যরা সেটিকে সংবিধানসম্মত বলে অনুমোদন দিয়েছে।

• গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবন-বিধান ও আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার পার্লামেন্ট বা সংসদের ওপর ন্যস্ত। সংসদ সদস্যরা নিজেদের খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী যখন যা ইচ্ছা আইন হিসেবে প্রণয়ন করে এবং সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে।

• যেকোনো আইন বা নিয়ম তৈরি করার চূড়ান্ত ক্ষমতা ও অধিকার একমাত্র আল্লাহর। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আল্লাহর এই বিশেষ ক্ষমতাটি মানুষের তৈরি পার্লামেন্ট বা সংসদকে দিয়ে দেওয়া হয়।

• গণতন্ত্রের দৃষ্টিতে একজন কাফির ও একজন মুসলমানের মর্যাদা ও অধিকারকে সমজ্ঞান করা হয়।

গণতন্ত্রে জ্ঞানী মূর্খ ফাসেক ও একজন মুত্তাকী মুসলমানের মর্যাদা ও অধিকার কে সমজ্ঞান করা হয়।প্রত্যেকের রায় প্রদানের অধিকার ও মান সমান।পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, একজন মুসলমান এবং একজন কাফির কখনো সমান হতে পারে না।

• গণতান্ত্রিক আইন অনুযায়ী একজন অমুসলিম বা কাফির ব্যক্তি, নারী মুসলমানদের বিচারক, শাসক কিংবা নীতি-নির্ধারক কর্মকর্তা পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে। অথচ ইসলামী শরিয়তের অকাট্য বিধান মোতাবেক কোনো কাফির ব্যক্তি মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর এমন কর্তৃত্বপূর্ণ পদ, জাজ কিংবা বিচারক হতে পারে না।

হাদিসের আলোকে:

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ ...لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ :لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

হযরত আবু বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

“যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছাল যে, পারস্যবাসী কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক পদে নিযুক্ত করেছে, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, "ঐ জাতি কখনো সফলকাম হতে পারবে না, যারা নিজেদের শাসনভার কোনো নারীর হাতে ন্যস্ত করে।”

ইসলামী শাসনব্যবস্থা:

ইসলামী শাসনব্যবস্থার (রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা) মূলনীতি সম্পূর্ণভাবে ওহী এবং শরীয়তের বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানবরচিত শাসন ব্যবস্থার সাথে এর মূল পার্থক্য হলো, এখানে ক্ষমতার উৎস মানুষ নয়, বরং খালিক বা স্রষ্টা।

কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের অনুসৃত 'সিয়াসা শরিয়্যাহ' (ইসলামী রাষ্ট্রনীতি)-র আলোকে ইসলামভিত্তিক শাসনব্যবস্থার মূল বিষয়সমূহ:

১. আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব (الحاكمية - আল-হাকিমিয়্যাহ):

ইসলামী শাসনব্যবস্থার একদম কেন্দ্রীয় ও প্রথম আকিদাগত ভিত্তি হলো সার্বভৌমত্ব এবং আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর।

ব্যাখ্যা

কোনো রাষ্ট্র প্রধান, সংসদ সদস্য বা জনগণ নতুন কোনো প্রকার আইন প্রণয়ন, সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবে না।

২. খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব (الخلافة):

ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক কোনো স্বাধীন ক্ষমতার মালিক নন, বরং তিনি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নকারী একজন প্রতিনিধি (খলিফা) মাত্র।

ব্যাখ্যা

শাসক রাষ্ট্রের মালিক নন, বরং জনগণের দ্বীন, জীবন, সম্পদ ও সম্মানের হেফাজতকারী এবং আল্লাহর বিধানের আমানতদার।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"হে দাউদ! আমি তোমাকে জমিনে প্রতিনিধি (খলিফা) করেছি; অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করো।" (সূরা সদ: ২৬)

৩. শুরা বা পারস্পরিক পরামর্শ (الشورى):

ইসলামী শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রশাসনিক মূলনীতি হলো 'শুরা' বা পরামর্শ। আল্লাহর হুকুমের অধীন থেকে রাষ্ট্রের যেকোনো নীতিনির্ধারণী বিষয়ে যোগ্য, সৎ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

কুরআনুল কারিমে,আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُم

"এবং তাদের পারস্পরিক কাজকর্ম পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।" (সূরা আশ-শূরা: ৩৮)

৪. ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা (العدالة - আল-আদালাহ):

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ কায়েম করা। আইনের চোখে শাসক ও সাধারণ নাগরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ (ন্যায়বিচার) ও ইহসানের নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা আন-নাহল: ৯০)

৫. আনুগত্যের পরিধি ও শর্ত (الطاعة - আত-তাআহ):

জনগণের জন্য আবশ্যক, তবে তা একটি শর্তের ওপর নির্ভরশীল, শাসককে অবশ্যই আল্লাহর বিধানের অনুগত হতে হবে।

ব্যাখ্যা

বিধানের অবাধ্যতায় কোনো আনুগত্য নেই।শাসক যদি শরীয়ত-বিরোধী কোনো নির্দেশ দেন, তবে তা মানা যাবে না।

হাদীসের আলোকে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো (সৃষ্টির) আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল সৎকাজে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

সারকথা:

ইসলামভিত্তিক শাসনব্যবস্থার মূল তত্ত্ব হলো "হুকুম একমাত্র আল্লাহর, বাস্তবায়নের দায়িত্ব শাসকের (পরামর্শের ভিত্তিতে), এবং লক্ষ্য হলো সমাজে আল্লাহর দ্বীন ও ইনসাফ কায়েম করা।”

ইসলামে শাসক / খলিফা নির্বাচনের পদ্ধতি :

খলীফা নির্ধারণের সর্বসম্মত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলীফা তিনটি পদ্ধতির কোনো একটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ক. **ইখতিয়ার:**

ইখতিয়ার হলো, 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর পক্ষ থেকে মনোনীত বা নির্বাচিত হওয়া। উদাহরণত, আবু বকর রা. এর খিলাফত। তাঁর খিলাফত সাকীফায়ে বনি সায়িদায় 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর খিলাফতের পক্ষে ঐকমত্য পোষণ করেন, তাঁর হাতে বাইআত হন এবং তাঁর খিলাফতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

খ. **ইস্তিখলাফ:**

পূর্ববর্তী খলিফার নির্ধারণের মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলিফা সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া। যেমন উমর রা. এর খিলাফত। তাঁর খিলাফত আবু বকর রা. এর নির্ধারণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছিলো।

গ. **শূরা**

'এ ক্ষেত্রে শূরা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, পূর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক 'আহলুল হারি ওয়াল আকদ'-কে দায়িত্ব দেওয়া। তাদের দায়িত্ব হবে, তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করা। যেমন উসমান বিন আফফান রা. এর খিলাফত। উমর রা. তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ করার জন্যে শীর্ষস্থানীয় ছয়জন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করলেন। যখন দেখলেন যে, লোকেরা উসমান রা.-কে চাচ্ছে, তখন তিনিই প্রথম তাঁর হাতে বাইআত হন। এরপর ছয়জনের অবশিষ্ট

সাহাবীগণও তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন। এরপর মুহাজির ও আনসার সাহাবাসহ অন্যান্য লোকজন তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

এ তিনটি শরয়ী পদ্ধতিই খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ বাস্তবায়িত হওয়ার পদ্ধতি। এ ছাড়াও আরেকটি পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে খিলাফায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। তবে তা শরীয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সেটি হলো, তাগাল্লুব তথা শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে। কেউ এ রকম পদ্ধতিতে খিলাফায় অধিষ্ঠিত হলে তাকে শর্তসাপেক্ষে খলীফা বলে গণ্য করা হবে। তবে সেটি খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ হবে না।

ইমাম নববী রহ. বলেন-

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ، فَهُوَ الْقَهْرُ وَالاسْتِيلاءُ، فَإِذَا مَاتَ الْإِمَامُ، فَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ مَنْ جَمَعَ شَرَائِطَهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافٍ وَلَا بَيْعَةٍ، وَقَهَرَ النَّاسَ بِشَوْكَتِهِ وَجُنُودِهِ، انْعَقَدَتْ خِلَافَتُهُ ،لِيَنْتَظِمَ شَمْلُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا، أَوْ جَاهِلًا، فَوَجْهَانِ .أَصَحُّهُمَا :انْعِقَادُهَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ

অর্থাৎ, "তৃতীয় একটি পদ্ধতি হলো শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে খলীফা হওয়া। সুতরাং খলীফা মারা যাওয়ার পর যদি খিলাফতের উপযুক্ত -কেউ দায়িত্বপ্রাপ্ত ও বাইআত গ্রহণ ছাড়াই ক্ষমতা ও সৈন্যবলে খিলাফতের দাবি করে এবং মানুষকে তা মেনে নিতে বাধ্য করে, তার খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে; যাতে করে মুসলমানদের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বহাল থাকে। তবে সে যদি খিলাফতের উপযুক্ত না হয়ে থাকে, যেমন সে ফাসিক বা মূর্খ; তাহলে সে খলীফা হবে কিনা, এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতানুযায়ী সে খলীফা বলে বিবেচিত হবে পূর্বোক্ত কারণেই। যদিও সে এর কারণে গুনাহগার হবে।"

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ'

ইমাম ইবনে নুজাইম মিসরী রহ. বলেন-

.أَهْلِ الْحَقِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ وَالرُّؤَسَاءِ

আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ হলেন- মুজতাহিদ (বিশেষজ্ঞ) উলামায়ে কিরাম ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ।

ইমাম নববী রহ. বলেন-

أَهْلِ الْحَقِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاس.

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হলেন উলামা, নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ।

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর বৈশিষ্ট্যাবলী:

'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় আল্লামা মাওয়ারদী রহ. বলেন- 'আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ' হওয়ার জন্যে তিনটি শর্ত থাকা আবশ্যক।

১. আদালত (ন্যায়পরায়ণতা): ফুকাহায়ে কিরাম ন্যায়পরায়ণতার যে সকল শর্ত বর্ণনা করেছেন, সেগুলো তার মাঝে বিদ্যমান থাকতে হবে।

২. খলীফা হওয়ার শর্তগুলো জানা থাকা: উক্ত ব্যক্তির এতটুকু ইলম থাকা আবশ্যক, যার ভিত্তিতে তিনি বুঝতে পারবেন, খিলাফতের শর্তগুলোর উপরে ভিত্তি করে কে খলীফা হওয়ার যোগ্য।

৩. রায় ও হিকমত: প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের যোগ্যতা থাকতে হবে, যার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি এমন একজন খলীফা নির্ধারণে সক্ষম হবেন, যিনি এ ইমামতের অধিক উপযুক্ত এবং উম্মাহর কল্যাণে অধিক উপযুক্ত ও জ্ঞাত হবেন।

গণতন্ত্রের শাসক নির্বাচনের পদ্ধতি

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপে সম্পন্ন হয়:

১. নির্বাচনের ঘোষণা ও প্রার্থিতা (Election Announcement):

দেশের সংবিধান অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর (সাধারণত ৫ বছর) নির্বাচনের ঘোষণা বা তফসিল দেওয়া হয়। যারা দেশ পরিচালনা করতে চান, তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বা স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়ান। পুরো দেশকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনেকগুলো নির্বাচনি এলাকায় (যাকে আসন বা Constituency বলা হয়) ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি এলাকা থেকে প্রার্থীরা লড়েন।

২. নির্বাচনি প্রচারণা (Election Campaign):

প্রার্থিতা নিশ্চিত হওয়ার পর প্রার্থীরা জনগণের কাছে যান। তারা সভা-সমাবেশ, লিফলেট এবং মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা ও নির্বাচিত হলে কী কী করবেন তা জনগণের সামনে তুলে ধরেন। উদ্দেশ্য একটাই, জনগণকে বুঝিয়ে তাদের মূল্যবান ভোট বা সমর্থন আদায় করা।

৩. ভোট গ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগ (Casting the Vote):

এটি নির্বাচনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ও নিবন্ধিত নাগরিক (ভোটার) তাদের নিজ নিজ এলাকার ভোটকেন্দ্রে যান।

পদ্ধতি: ভোটাররা একটি ঘেরা বা গোপন কক্ষে প্রবেশ করে একটি কাগজের ব্যালটে (Ballot Paper) তাদের পছন্দের প্রার্থীর প্রতীকের ওপর সিল মারেন অথবা আধুনিক ব্যবস্থায় ইভিএম (Electronic Voting Machine) বা বোতাম চেপে তাদের রায় প্রদান করেন।

৪. ভোট গণনা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায় (Majority Rule):

ভোট দেওয়ার সময় শেষ হলে ব্যালট বাক্স খোলা হয় এবং ভোট গণনা শুরু হয়। গণতান্ত্রিক শাসক নির্ধারণের সবচেয়ে বড় নিয়মই হলো 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা' বা Majority। অর্থাৎ, যিনি সবচেয়ে যোগ্য বা জ্ঞানী, তিনি বিজয়ী হবেন এমন কোনো কথা নেই; বরং যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি মানুষের ভোট পাবেন, তাকেই ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি বা বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হবে।

৫. সরকার বা শাসক গঠন (Formation of Government):

এভাবে সারাদেশের বিভিন্ন আসন থেকে প্রার্থীরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্ট বা সংসদে যান। যে রাজনৈতিক দলটি সংসদে সবচেয়ে বেশি আসনে বিজয়ী হয়,দেশের আইন অনুযায়ী সেই দলকেই সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়।
পরবর্তীতে সেই বিজয়ী দলের নেতারাই প্রধানমন্ত্রী, হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং পুরো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নেন। যারা কম আসন পায়, তারা সংসদে 'বিরোধী দল' হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসক নির্ধারণের উপরোক্ত ধাপগুলোর সাথে ইসলামী শাসনব্যবস্থার (খিলাফত) নীতিগত ও মৌলিক সংঘাতগুলো সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো:

ক্ষমতা ও নেতৃত্ব চাওয়া (প্রার্থিতা):

গণতন্ত্রে প্রার্থীকে নিজে থেকে ক্ষমতা চাইতে হয় এবং নির্বাচনে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু ইসলামে নিজে থেকে নেতৃত্ব বা পদ চাওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

আত্মপ্রচার ও প্রচারণা:

নির্বাচনি প্রচারণায় প্রার্থীকে নিজের প্রশংসা নিজে করতে হয় এবং অনেক সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গীবত বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতির আশ্রয় নিতে হয়। ইসলামে অহংকার, আত্মপ্রচার এবং প্রতারণা সম্পূর্ণ হারাম।

ভোটারের যোগ্যতার মানদণ্ড:

গণতন্ত্রে একজন সৎ, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি এবং একজন চরম অপরাধী বা মূর্খের ভোটের মূল্য সমান। কিন্তু ইসলামে শাসক নির্বাচনের ভার সাধারণ জনতার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি; বরং তা সমাজের জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায় (Majority Rule):

গণতন্ত্রে সত্য-মিথ্যা বা যোগ্যতার মাপকাঠি হলো 'সংখ্যা'। যার পক্ষে বেশি মানুষ, সে-ই বিজয়ী। কিন্তু ইসলামে যোগ্যতার মাপকাঠি হলো তাকওয়া ও ইলম। সংখ্যাধিক্য কখনো ইসলামী দৃষ্টিতে সত্য ও ন্যায়ের চূড়ান্ত মাপকাঠি হতে পারে না।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা (সার্বভৌমত্ব):

গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদে গিয়ে আইন তৈরি করেন, এমনকি চাইলে তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ করা বিষয়কেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বৈধ করতে পারেন। কিন্তু ইসলামে বিধান প্রণয়ন বা হালাল-হারাম নির্ধারণের একক অধিকার একমাত্র আল্লাহর। শাসক কেবল আল্লাহর দেওয়া শরিয়ত বাস্তবায়ন করবেন, নতুন আইন বানাবেন না।

নির্দিষ্ট মেয়াদ বনাম বায়আত:

গণতন্ত্রে সাধারণত ৫ বছর পরপর শাসক পরিবর্তনের নিয়ম থাকে, শাসক যতই যোগ্য বা অযোগ্য হোন না কেন। কিন্তু ইসলামে শাসকের সাথে 'বায়আত' বা চুক্তির ভিত্তি

হলো শরিয়তের অনুসরণ। শাসক যতদিন কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন, ততদিন জনগণ তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবে; এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো মেয়াদ নেই।

প্রচলিত ভোট ব্যবস্থা ও ইসলামী শূরা:

বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'নির্বাচন' হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনগণ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে থাকে। বাহ্যিকভাবে এটি প্রশাসনিক কাজ, নাগরিকদের জীবনযাপন পদ্ধতি প্রণয়ন ও সমস্যা সমাধানের জন্য শাসক নির্ধারণের প্রক্রিয়া মনে হলেও,ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, জনগণ নিজেদের জন্য এমন একজন বিধানদাতা বা জীবনব্যবস্থা প্রণেতাকে বাছাই করছে, যার আনুগত্যকে তারা চূড়ান্ত বলে মেনে নেয়।
নির্বাচনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

নির্বাচন বা Election শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ 'Eloge' (পছন্দ করা) থেকে। 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ম্যান, মিথস অ্যান্ড ম্যাজিক'-এর বর্ণনানুসারে, নির্বাচনের এই ধারণাটি মূলত প্রাচীন খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের ঐতিহ্যগত কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে যখন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের চিন্তাধারা শুরু হয়, তখন এর রূপ আজকের মতো ছিল না। সে সময় সমাজে পুরুষদের, বিশেষ করে জমিদার বা শাসক শ্রেণির একক আধিপত্য ছিল এবং ভোটাধিকার কেবল তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। দীর্ঘকাল ধরে দরিদ্র মানুষ, দিনমজুর ও নারীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল।
১৯২০ সালের পর থেকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়ার বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে ব্যবস্থা একসময় সমাজের বিশাল একটি অংশকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল, আজ তারাই আবার ভোটাধিকার না থাকাকে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে নিন্দা করে!

নির্বাচনের মাধ্যমে যখন একজন প্রতিনিধিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়, তখন তা সরাসরি কালিমাতুত তাওহীদ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। কারণ এর মাধ্যমে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো মানবীয় সত্তাকে বিধানদাতা বা হাকিম হিসেবে মেনে নেওয়া হয়, যা সুস্পষ্ট শিরক।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশ কে চালাবে বা শাসক কে হবেন, তা নির্বাচন করার মূল ভিত্তিই হলো "সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ"। তাই ধরে নেওয়া হয়, জনগণই ঠিক কর বে তাদের ওপর কে শাসন করবে। আর জনগণ এই সিদ্ধান্তটি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে, তাকেই বলা হয় ভোট (Vote)।

ভোট কী এবং কেন?

'ভোট' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো মতামত বা রায় দেওয়া। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট হলো একজন নাগরিকের সবচেয়ে বড় আইনি ও রাজনৈতিক অধিকার। এর মাধ্যমে একজন সাধারণ নাগরিক নির্দিষ্ট প্রার্থীদের মধ্য থেকে তার পছন্দের ব্যক্তিকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেয়।

গণতান্ত্রিক ভোটের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো "এক ব্যক্তি, এক ভোট" (One person, one vote)।

অর্থাৎ, এই ব্যবস্থায় একজন কোটিপতি ব্যবসায়ীর ভোটের যে মূল্য, একজন সাধারণ কৃষকের ভোটের মূল্যও একই সমান। এই ভোটের মাধ্যমেই মূলত সাধারণ জনগণ তাদের শাসককে নিয়োগ দেয় এবং মেয়াদ শেষে চাইলে ক্ষমতা থেকে সরিয়েও দিতে পারে।

বর্তমানে অনেকে এই মানব-রচিত কুফরি নির্বাচন ও ভোট পদ্ধতিকে ইসলামী ‘শূরা’ (পরামর্শ) ব্যবস্থার আধুনিক রূপ বলে দাবি করেন।

তারা পবিত্র কোরআনের আয়াত:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও" (সূরা আন-নিসা: ৫৮)

উল্লেখ করে ভোটকে একটি 'আমানত' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু শরীয়তের মানদণ্ডে শূরা ও নির্বাচনের মাঝে আসমান-জমিন পার্থক্য রয়েছে:

সিদ্ধান্তের বাধ্যবাধকতা:

ইসলামে পরামর্শ বা শূরা হলো একটি মতামত, যা ইসলামী শাসক গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়কে প্রত্যাখ্যান করার কোনো সুযোগ নেই, তা মানতে শাসক বাধ্য।

যোগ্যতার মানদণ্ড: ইসলামী শূরা ব্যবস্থায় পরামর্শদাতাদের বিশেষ ইলম, তাকওয়া ও যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে একজন বড় আলেম এবং একজন অজ্ঞ বা অপরাধীর ভোটের অধিকার ও মূল্য সম্পূর্ণ সমান।

অংশগ্রহণের অধিকার: শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিমদের জাতীয় ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে অমুসলিমদের পরামর্শ দেওয়ার অধিকার নেই। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদেরকে সেই সুযোগ ও সমান অধিকার প্রদান করে।

বিভাজন নীতি (Divide & Rule) প্রয়োগ এবং আন্তর্জাতিক আধিপত্য:

ভোট ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত উম্মাহর মাঝে ঐক্যের বদলে চরম বিভেদ ও অনৈক্যের বিষফোড়া রোপণ করেছে। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির মাধ্যমে অল্পসংখ্যক ইসলামপন্থী মানুষকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের ফাঁদে ফেলে শতধাবিভক্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের দেশেই বিশটিরও বেশি ইসলামী দল বিদ্যামান। নির্বাচনের মাঠে এক দলের মুফতির বিপরীতে দাঁড়াচ্ছেন আরেক দলের সাধারণ শিক্ষিত তরুণ। ফলে নিজেদের মাঝে শুরু হচ্ছে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি, গীবত ও অপবাদ; আর দূর থেকে তা দেখে ফায়দা লুটছে ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী গোষ্ঠীগুলো।

পাশাপাশি তো রয়েছে আন্তর্জাতিক পরাশক্তিগুলোর নগ্ন হস্তক্ষেপ। এটি একটি 'ওপেন সিক্রেট' যে, যেকোনো নির্বাচনের আগেই রাজনৈতিক নেতাদের দিল্লি বা ওয়াশিংটনমুখী দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়। কারণ আগামী পাঁচ বছর কারা তাদের অনুগত হয়ে দেশ চালাবে, তা মূলত ওই পরাশক্তিরাই নির্ধারণ করে দেয়।

রাজনৈতিক দলগুলোর তখন এ ক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না।আর গণতন্ত্রের তথাকথিত 'সকল ক্ষমতার উৎস' সাধারণ জনগণ এসব ক্ষেত্রে কেবল নীরব দর্শক হয়ে চেয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

গণতন্ত্রের আকিদা বনাম ইসলামী আকিদা:

জনগণই এ ব্যবস্থায় বিধান প্রণয়ন করে এবং তারা নিজেদের তৈরি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কারো কাছে জবাবদিহি করে না। জনগণই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা ধারণ করে এবং জনগণই তাদের সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। তাই বলা যায়, জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু। আর জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করাই হচ্ছে, গণতন্ত্রের মূল বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি। এ বিশ্বাস থেকেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

ইসলাম এ বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী আকীদার ভিত্তি হচ্ছে- জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলার আদেশ এবং নিষেধ অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলা যে ব্যবস্থা দিয়েছেন, সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা বাধ্যতামূলক। এর বিপরীত গণতন্ত্র হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত একটি ব্যবস্থা, যার সাথে ইসলামের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিধি-বিধান নাযিল করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে আল্লাহর বিধি-বিধানকে অস্বীকার করা হয়। তাই এটি মূলত আল্লাহর বিধানকে অস্বীকারকারীদের ব্যবস্থা। আল্লাহ তা'আলা এসব বর্জন করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন-

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ

"তারা বিচার-ফয়সালার জন্যে তাগুতের কাছে যেতে চায়; অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করার জন্যে তাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।"

যে আকীদা থেকে এ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যে ভিত্তির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত এবং যে চিন্তা-ধারণার সে জন্ম দেয়, তা সম্পূর্ণরূপে মুসলিমদের আকীদা বা বিশ্বাসের বিপরীত।

গণতন্ত্রের আকীদা থেকে নিম্নোক্ত দুটি ধারণার উদ্ভব হয়:

১. সার্বভৌমত্ব জনগণের জন্যে।

২. জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

উপরোক্ত দুটি ধারণার উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমারা তাদের ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। সার্বভৌমত্ব হলো জনগণের জন্যে এবং জনগণই হলো সকল ক্ষমতার উৎস। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ দুটি ধারণাই বাস্তবায়ন করা হলো। ফলে জনগণই হয়ে গেলো সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং সকল ক্ষমতার উৎস।

পক্ষান্তরে ইসলামে সার্বভৌমিক ক্ষমতা হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের কিছু শাখাগত বিষয় বাহ্যিকভাবে এক মনে হলেও বাস্তবে এই দুটি দীন বা জীবনব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একটি মেনে নিলে অপরটি আপনাআপনি বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই উভয়টির সংমিশ্রণ হতে পারে না। হয় ইসলাম থাকবে; নচেৎ গণতন্ত্র।

গণতন্ত্র একটি স্বতন্ত্র ধর্ম: তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

কোনো মতবাদ বা ব্যবস্থাকে কুফরি সাব্যস্ত করার জন্য তার প্রতিটি উপাদান বা নিয়মনীতি কুফরি হওয়া আবশ্যক নয়; বরং তার মূল আদর্শিক ভিত্তির একটি অংশ কুফরিতে লিপ্ত হওয়াই একে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণার জন্য যথেষ্ট।

ইসলামের সাধারণ জ্ঞান রাখা ব্যক্তিও জানেন যে, কোনো মতবাদকে কুফরি সাব্যস্ত করার জন্য তার প্রতিটি উপাদান কুফরি হওয়া জরুরি নয়। যেমন খ্রিস্টধর্ম বা সনাতন ধর্মের সব নিয়মই কিন্তু ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাই বলে সেগুলো কখনো ‘ইসলামী খ্রিস্টবাদ’ বা বৈধ হয়ে যায় না।

অতএব, গণতন্ত্রের একটি মৌলিক অংশ কুফরি হওয়াই একে কুফর সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট; ঠিক যেমন একটি মাত্র কুফরি কাজে লিপ্ত হওয়াই একজন মানুষের ঈমান ভঙ্গের জন্য যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে, গণতন্ত্রের মূলনীতি পুরোটাই কুফরের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য প্রচলিত ধর্মের মতো এটিও ইসলামের সমান্তরালে দাঁড়ানো একটি স্বতন্ত্র ধর্ম।

ঐতিহাসিকভাবে মোগল সম্রাট আকবর যখন 'দীনে ইলাহী' প্রবর্তন করেছিলেন, তখন 'ধর্ম' নাম থাকার কারণে মুসলিম উম্মাহ তা সহজেই চিনে নেয় এবং প্রত্যাখ্যান করে।

পশ্চিমা বিশ্ব এই ইতিহাস থেকে চতুরতার সাথে শিক্ষা নিয়ে তাদের তৈরি নতুন জীবনব্যবস্থাকে কোনো ধর্মের নাম না দিয়ে 'গণতন্ত্র' হিসেবে উপস্থাপন করেছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মুসলিমদের অজান্তেই তাদের ঈমানী চেতনাকে ধ্বংস করা।

প্রকৃতপক্ষে, আদর্শিক গভীরতায় বিচার করলে গণতন্ত্র কেবল একটি রাজনৈতিক কাঠামো নয়, বরং ইসলামের সমান্তরালে দাঁড় করানো একটি পরিপূর্ণ ও স্বতন্ত্র ধর্ম। একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের যেমন নিজস্ব পরিভাষা, অনুশাসন ও দণ্ডবিধি থাকে, গণতন্ত্রেরও ঠিক তেমনি নিজস্ব কাঠামো রয়েছে।

ইসলামে যা 'ফরজ', গণতান্ত্রিক ধর্মে তা নাগরিক দায়িত্ব; ইসলামে যা 'জায়েজ বা নাজায়েজ অথবা হালাল বা হারাম', গণতন্ত্রে তা রূপান্তরিত হয়েছে 'আইনসম্মত ও আইনবিরোধী' শব্দে।

এই মানব-রচিত ধর্মের মূল নীতি-নির্ধারকেরা অর্থাৎ পশ্চিমা বা মার্কিন শক্তি এর সর্বোচ্চ বিধানদাতার ভূমিকা পালন করে। তাদের আইন বাস্তবায়নকারী বাহিনীগুলো এই ব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে কাজ করে।

ইসলামে যেমন দ্বীন ত্যাগকারীকে 'মুরতাদ' বলা হয়, গণতন্ত্রেও তেমনি এই ব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি ও আইনকে অস্বীকারকারীকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দেওয়া হয়। ইসলাম

ত্যাগকারীর শাস্তি যেমন মৃত্যুদণ্ড, তেমনি গণতান্ত্রিক ধর্মকে অস্বীকার করার অপরাধে বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে মানুষকে হত্যার মুখোমুখি হতে হয়।

সুকৌশলী শিক্ষাব্যবস্থা ও রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মনস্তত্ত্বকে এমনভাবে বদলে দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ নিজেকে মুসলিম দাবি করলেও পরোক্ষভাবে এই কুফরি ব্যবস্থার একনিষ্ঠ অনুসারীতে পরিণত হচ্ছে।
গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় কুফরি দিক হলো এর মূল স্লোগান, "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস" এবং আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত অধিকার সংসদের বা পার্লামেন্টের।
এটি পবিত্র কুরআনের অকাট্য নির্দেশনার সাথে সরাসরি সংঘাত তৈরি করে।
কুরআন যেখানে স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, আল্লাহই যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন এবং সমস্ত শক্তির মালিক একমাত্র তিনিই; সেখানে গণতন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার উৎস দাবি করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারীর সামনে যেখানে মানবজাতি সম্পূর্ণ অসহায়, সেখানে জনগণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ভাবা এক প্রকার অলীক কল্পনা ও ধৃষ্টতা।

একইভাবে, ইসলামে আইন প্রণয়নের একক অধিকার যেখানে কেবল আল্লাহর, সেখানে গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যদের সেই ঐশ্বরিক অধিকার দেওয়া হয়, যা স্পষ্ট শিরক। সুতরাং, সামঞ্জস্যহীন এই মানবরচিত মতবাদটি তাওহীদের মূল উৎপাটনকারী একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বাতিল ধর্ম, যা গ্রহণ করলে মানুষের ঈমানের অস্তিত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, গণতন্ত্রকে সাধারণ কোনো রাজনৈতিক পদ্ধতি মনে করা মস্ত বড় ভুল; এটি আসলে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি করা একটি স্বতন্ত্র বাতিল ধর্ম।

গণতন্ত্র কেন কুফরি ব্যবস্থা:

গণতন্ত্রের ভিত্তি 'ফাসলুদ দ্বীন আনিদ দাওলা' অর্থাৎ 'রাষ্ট্র থেকে ধর্ম পৃথকীকরণ' নীতির উপর। তাই তাদের স্লোগান- 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার', 'রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই' ইত্যাদি। জনগণ কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তাদের ইচ্ছা ও খাহেশ এবং তাদের অভিব্যক্তিই চূড়ান্ত আইন। তারা তাদের ইচ্ছা মতো আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে। হারামকে হালাল করে, হালালকে হারাম করে।

এই শাসন-ব্যবস্থায় আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য বর্জন করা হয়। তাঁর নাযিলকৃত দ্বীন ও শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর বিপরীতে তাগুত, শয়তান ও গাইরুল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত করা হয়। এদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, খেয়াল-খুশি ও খাহেশ-প্রবৃত্তির ভিত্তিতে রচিত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানকে জীবন-বিধানরূপে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর আইন পরিবর্তে এই মানবরচিত বিধানকে জীবনবিধান হিসেবে গ্রহণ করাও সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার।

গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে শিরক এবং কুফরী হিসাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন :

(১) সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে :

গণতন্ত্রের মূল কথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ সকল ক্ষমতার মালিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। একথা নিঃসন্দেহে শিরক।

কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ ‘রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই’ (বনী ইসরাঈল ১৭/১১১)।

তিনি আরো বলেন,

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

“তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন” (আলে ইমরান ৩/২৬)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান’ (মূলক ৬৭/১)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ

“যার হাতে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই” (ফুরক্বান ২৫/২)।

আল্লাহর বাণী থেকে বুঝা গেল আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক। মানুষকে ক্ষমতার মালিক বা উৎস বানানো তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের শামিল, যা স্পষ্ট শিরক।

(২) **আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে :**

গণতন্ত্রে আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেটা বলবে, যে বিষয়ে সম্মত হবে সেটাই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন, যার বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ।

গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কুরআন-সুন্নাহর উপরে স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরী করতে পারে, এমনকি আল্লাহর আইনকে বাতিলও করতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়-

১. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চুরির শাস্তি হাত-কাটা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এর পরিবর্তে জেল-জরিমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন।

২. আল্লাহ তাআলা সুদ হারাম করেছেন এবং সুদখোরদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ও আর্থিক লেনদেনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে, এর জন্য লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। গোটা অর্থব্যবস্থার ভিত্তি এর উপরই স্থাপন করা হয়েছে। এ হচ্ছে হারামকে হালালকরণ।

৩. আল্লাহ তাআলা জিহাদ ফরয করেছেন। কিন্তু গণতন্ত্রে একে সন্ত্রাস এবং মানবতাবিরোধি জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ হচ্ছে হালালকে হারামকরণ।

৪.নিষিদ্ধ কাজের লাইসেন্স দেওয়া।

৫. নেশাজাতীয় দ্রব্যের লাইসেন্স দেওয়া।

৬. ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, ১৬ বছর বয়স পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা করলে তার বৈধতা দেওয়া।

৭. স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলে তার বৈধতা দেওয়া।

৮. যাত্রা, সিনেমাহলে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার চর্চাকে অনুমোদন দেওয়া ইত্যাদি।

এ ধরনের নীতিমালা নিঃসন্দেহে আল্লাহর রুবুবিইয়্যাতের (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের) ক্ষেত্রে শিরক এবং স্পষ্ট কুফরী।

কেননা আল্লাহ বলেন,

اَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

‘শুনে রাখো! সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার’’ (আ‘রাফ ৭/৫৪)।

তিনি আরো বলেন,

-إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ,

‘‘আল্লাহ ব্যতীত কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’ (ইউসুফ ১২/৪০)।’’

তিনি আরো বলেন,

وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

‘আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী’ (রা‘দ ১৩/৪১)।

এভাবে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন কিংবা হালালকে হারাম বা হারামকে হালালকরণ সুস্পষ্ট শিরক ও কুফরে আকবার।

যেমন- কোন শাসক যদি আইন প্রবর্তন করে যে, 'আল্লাহর শরীয়তে যদিও আসরের নামায চার রাকাআত ফরয এবং আমরাও তা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদের দেশে

এখন থেকে আসরের নামায দুই রাকাত পড়তে হবে। চার রাকাআত পড়া দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে'।

তাহলে এমন শাসক, শরীয়াতের বিধান অনুযায়ী নিশ্চিত কাফের। শরীয়তের বিধান তথা 'আসরের নামায চার রাকাত ফরয' স্বীকার সত্ত্বেও সে কাফের।

যারা নামায পরিবর্তন করে তারা, আর যারা যিনা, চুরি ইত্যাদির শরীয়ত-নির্ধারিত অকাট্য শাস্তি পরিবর্তন করে-তাদের মধ্যে কী কোন ব্যবধান রয়েছে? না, নেই।

(৩) **বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে :**

গণতন্ত্রে যেকোন মতবিরোধ বা বিতর্কের চূড়ান্ত মিমাংসাকারী বানানো হয় সংবিধান ও এর ধারা সমূহ এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে। এটা একটা স্পষ্ট কুফরী।

মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا- '

"অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতন্ডা কর, তাহলে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম"

মন্ত্রী এম.পি এবং আইন প্রণয়ন সংস্থার সদস্য- যারা এই কুফরী আইন প্রণয়ন বা প্রবর্তনে লিপ্ত, যেসব বাহিনীর শক্তিবলে এই কুফরী শাসন-ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে, এর হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণ করছে, এর প্রহরায় নিয়োজিত আছে, এই শাসন-ব্যবস্থার স্বরূপ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা এর প্রতি সন্তুষ্ট, এর সমর্থক, প্রচারক এবং যারা জনশক্তি বা আর্থিক যোগান দিয়ে কিংবা অন্য কোন উপায়ে এর সাহায্য-

সহযোগিতা করবে, শক্তি যোগাবে, এসব দলকে ভোট দেবে তারা সকলে কুফরে আকবারে লিপ্ত।

গণতন্ত্রের শরীয় হুকুম

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বরূপ থেকে বোঝা গেলো যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অর্থ- মানবজাতির জন্যে আল্লাহর প্রণীত বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা। আর এটা সুস্পষ্ট কুফর। শরীয়তের দলীল তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস সবকিছুর দ্বারা এর কুফরী স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে পর্যায়ক্রমে দলীলসমূহ পেশ করা হলো।

কুরআন থেকে দলীল:

দলীল-১

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ৪০)

"আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর তা'আলার-ই। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।"

দলীল-২

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

(সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৪৪)

"আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ করা বিধান অনুযায়ী বিচার করে না, সেসব লোকেরাই কাফির।"

দলিল-৩

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (সূরা মায়িদা,আয়াত নং ৫০)

"তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?"

দলিল-৪

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ ۗ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

(সূরা আরাফ,আয়াত নং ৫৪)

"স্মরণ রেখ! সৃষ্টি ও আদেশ দান তাঁরই কাজ। আল্লাহ অতি বরকতময়,যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক।"

দলিল-৫

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰـهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

(সূরা তাওবাহ,আয়াত নং ৩১)

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র।”

দলিল-৬

وَّلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖٓ اَحَدًا

(সূরা কাহাফ,আয়াত নং ২৬)

“তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরীক করেন না।”

দলিল -৭

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

“নিশ্চিত এটা আমার সরল পথ। অতএব এ পথেরই অনুসরণ করুন, অন্যান্য পথোর অনুসরণ করবেন না; নচেৎ সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।"(সূরা আনআম,আয়াত নং ১৫৩)

হাদীস থেকে দলীল:

দলীল-১

আল ফিরদাউস বি-মাসূরিল খিতাবে বর্ণিত হয়েছে-

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُثْمَانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَنْبُورٍ نَا أَبُوْ يُوْسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم قَالَ :يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمُ يَحْضُرُونَ السُّلْطَانَ فَيَحْكُمُوْنَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ وَلَا يَنْهَوْنَ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ.

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"শেষ যুগে একটি জাতি আসবে, যারা এমন শাসকের কাছে যাতায়াত করবে, যারা আল্লাহর হুকুম বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার ও শাসন করবে। তারা সে শাসককে এ থেকে বাধা দেবে না। তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।"

আল-ফিরদাউস বি-মাসূরিল খিতাব (দাইলামী): ৫/৪৫৫, হাদীস নং ৮৭২৭ (দারুল কুতুবিল

দলীল-২

তাবারানী আল মু'জামুস সগীরে বর্ণিত হয়েছে-

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ أَبُو اللَّيْثِ اللَّيْثُ أَبُو الْقَاسِمِ (النَّحْوِيُّ الْعَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، سَمِعْتُ الْوَضِينَ بْنَ عَطَاءٍ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ أَمْرَاءُ يَقْضُونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ وَإِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ.

অর্থাৎ মুআয বিন জাবাল রা. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"সাবধান। অচিরেই এমন কিছু শাসক আসবে, যারা তোমাদের উপর বিচারকার্য পরিচালনা করবে। তোমরা যদি তাদের আনুগত্য করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেবে। আর যদি তাদের বিরোধিতা করো, তাহলে তারা তোমাদেরকে হত্যা করবে।"

আল মু'জামুস সগীর, তাবারানী: হাদীস নং ৭৪৯ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত)

দলিল -৩

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ :خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ :هَذَا سَبِيلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ :هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ :مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ) :وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا - تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ] (الأنعام :١٥٣[

অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে একটি সরল রেখা এঁকে বললেন, "এটা হলো আল্লাহর পথ। অতঃপর সে রেখার ডানেবামে অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন, এগুলো হলো অন্যান্য পথ, যার প্রত্যেকটির মাথায় একজন করে শয়তান বসে এ পথের দিকে আহবান করতে থাকে।"

অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

নিশ্চিত এটা আমার সরল পথ। অতএব এ পথেরই অনুসরণ করুন, অন্যান্য পথোর অনুসরণ করবেন না; নচেৎ সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। "(সূরা আনআম,আয়াত নং ১৫৩)

মুসনাদে আহমাদ: ৭/২০৭, হাদীস নং ৪১৪২ (মুআসসাসাকুর রিসালা, ভৈরড)

দলিল-৪

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবত থাকবে তারা অচিরেই প্রচুর মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা অবশ্যই আমার সুন্নাহ ও আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহ অনুসরণ করবে, তা দাঁত দিয়ে কামড়ে আঁকড়ে থাকবে। আর (দীনের মাঝে) নবআবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে সাবধান। কারণ, প্রতিটি নবআবিষ্কৃত জিনিস হলো বিদআত এবং প্রতিটি বিদআত হলো ভ্রষ্টতা। "

এমতাবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, স্বীয় অন্তরে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী বদ্ধমূল করে নেওয়া-

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"অতএব আপনার উপর যে অহী (ঐশী প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। "(সূরা যুখরুফ, আয়াত নং ৪৩)

সুনানে আবু দাউদ: ৪/২০০, হাদীস নং ৪৬০৭ (আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরুত)

ইজমা থেকে দলীল:

উম্মতের সকল উলামায়ে কিরাম গণতন্ত্র কুফরী হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বিখ্যাত ইমাম ও মুফাসসির আল্লামা জাসসাস রহ. নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

আহকামুল হাকিমীন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

সূরা নিসা, আয়াত নং ৬৫

"কিন্তু না, আপনার রবের কসম! তারা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা-সংকোচ অনুভব না করে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। "

ইমাম জাসসাস রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَّ شَيْئًا مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ أَوَامِرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ رَدَّهُ مِنْ جِهَةِ الشَّكِّ فِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقَبُولِ وَالامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ، وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي حُكْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَتْلِهِمْ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِمْ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى حَكَمَ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاءَهُ وَحُكْمَهُ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ.

অর্থাৎ এ আয়াতই প্রমাণ করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদেশ-নিষেধসমূহ থেকে কোনো একটি বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। চাই সে সন্দেহবশত প্রত্যাখ্যান করুক; অথবা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাক এবং মেনে নেওয়া থেকে বিরত থাকুক।

আয়াতটি সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক যাকাত আদায়ে অস্বীকারকারীদের মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদেরকে হত্যা ও তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দি করার সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সাব্যস্ত করে।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা ফয়সালা দিয়েছেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিচার ও বিধানকে মেনে নেবে না, সে ঈমানদার নয়।

আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস: ২/২৬৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

আল্লাহ তা'আলার একটি বিধান মেনে না নেওয়ার কারণে সাহাবায়ে কিরাম রা. উক্ত ব্যক্তিদেরকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

ইমাম জাসসাস রহ. এর ভাষ্যমতে

'যে ব্যক্তি কোনো একটি বিধানকে প্রত্যাখ্যান করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।'

অতএব, যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে দিয়ে এ স্লোগান প্রচার করছে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' এবং আল্লাহপ্রদত্ত হালাল গুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ আর হারামগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধ করছে, সেই পদ্ধতি তো সুস্পষ্ট কুফর।

কিয়াস থেকে দলীল:

সকলের জানা, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাতের পর আবু বকর রা. খিলাফতের গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন। তখন একদল লোক যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানালো। তাদের নিকট কারণ দর্শানোর আদেশ করা হলে তারা কুরআন থেকে দলীল পেশ করলো,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (সূরা তাওবা, আয়াত নং ১০৩)

"আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকা-যাকাত গ্রহণ করুন। "

তারা যুক্তি পেশ করে বললো, এখানে যাকাত আদায়ের আদেশ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করে দেওয়া হয়েছে। আর এখন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেই, তাই আমরা যাকাত দেবো না।

অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম রা. তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ করে তাদের মাল-সম্পদ গনীমত হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে বন্দি করেন।

ইমাম জাসসাস রহ., ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ., কাযী আবু ইয়ালা রহ., ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.-সহ অসংখ্য ফকীহ ও মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রা. তাদেরকে মুরতাদ আখ্যায়িত করেই তাদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

অনেক ফকীহ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম রা. এর ইজমা ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম রা. এর যুদ্ধের ধরনও এর সততা প্রমাণ করে। কেননা, সাহাবায়ে কিরাম রা. তাদের পরিবার পরিজনকে যুদ্ধবন্দি করেছিলেন।

উক্ত ব্যক্তিরা কালিমা পাঠ করতো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতো। নামায, রোযা, হজ, তাহাজ্জুদসহ অন্যান্য সকল বিধানও পালন করতো। কিন্তু শুধুমাত্র একটি বিধান মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে সাহাবায়ে কিরাম রা. সর্বসম্মতিক্রমে তাদেরকে মুরতাদ ঘোষণা করেছিলেন। এরপর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

সুতরাং দ্বীনের একটি মাত্র বিধানকে অমান্য করলে যেখানে মানুষের ঈমান থাকে না, তাহলে যে শাসনব্যবস্থা পুরো রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করে দিয়েছে এবং স্লোগান

তুলছে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' তা আকিতাগতভাবে ইসলাম পরিপন্থী এবং স্পষ্ট কুফরী।

শুধু তাই-ই নয়; বরং নিজেদের স্বপক্ষে কুরআনের এ আয়াত থেকে দলীলও পেশ করছে যে,

“لَا إِكْرَاه فِي الدِّين “

"দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।"

একটি নয়, দুটি নয়, আল্লাহর শত শত বিধানকে অমান্য করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক পন্থায়; কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী অসংখ্য আইন বিদ্যমান রয়েছে।

যদি একটি বিধান প্রত্যাখ্যানের কারণে মুরতাদ হয়, তাহলে এত সব অসংখ্য বিধান অমান্য ও নিষিদ্ধ করার পর গণতন্ত্র যে কুফরি ব্যবস্থা, এটা নিয়ে কোনো সংশয় থাকা উচিত নয়।

ইসলাম ও গণতন্ত্র:

গণতন্ত্র ও ইসলাম একটি আরেকটির বিপরীত ও বিরোধী। ইসলাম কখনো গণতন্ত্রের সাথে এক হতে পারে না। গণতন্ত্রের সাথে মিলে মুসলমানের মুসলমানিত্ব অবশিষ্ট থাকে না। কারণ গণতন্ত্রের প্রকৃতিই হলো, কিছু বিশ্বাস আল্লাহর উপর রাখা আর বাকি সবটুকু বিশ্বাস মাখলুকের উপর রাখা। আল্লাহ তা'আলা একজন মুমিনকে পরিপূর্ণভাবে নিজের করে দেখতে চান। শস্য পরিমাণও যদি কোনো মুসলমান অন্যের হয়ে যায়, তবে সে অন্যেরই রয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার সাথে তখন আর তার কোনো সম্পর্ক বাকি থাকে না।

গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। গণ মানুষের ইচ্ছা বা আইন অনুসারে পরিচালিত হয় বলেই এর রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা হয়।

অন্যদিকে ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা। আল্লাহর খলীফা হিসাবে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফত বলা হয়।

প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, ‘রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দু’টিই মানব রচিত মতবাদ। পক্ষান্তরে ‘খেলাফত’ আল্লাহর অনুমোদিত শাসন ব্যবস্থার নাম।

নিম্নে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষের দিকগুলো উল্লেখ করা হলো:

(১) গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা স্পষ্ট শির্ক।

পক্ষান্তরে ইসলামের খিলাফতি রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত।

(২) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ হল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা।

পক্ষান্তরে খিলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা।

(৩) গণতন্ত্রের মূল দর্শন হল মানুষকে সন্তুষ্ট করা যেভাবেই হোক।

পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে মানুষের সেবা করা।

(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয় না। এর রাজনীতি ধর্ম-বিবর্জিত।

পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে।

(৫) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক, তাই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমনকি বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সাব্যস্ত করার অধিকার জনগণের। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যেকোন ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে, তেমনি ইচ্ছামত যেকোন আইন রচনা করতে পারে। এজন্য 'Majority must be granted' হল গণতন্ত্রের চূড়ান্ত কথা।

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহকেই যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানা হয় সেহেতু ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতানুসরণ করার নীতিকে ইসলাম এড়িয়ে চলে। কেননা আল্লাহ অধিকাংশের মতানুসরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন' (আন'আম ১১৬)।

(৬) গণতন্ত্রে রাজনীতি চলে বহুদলীয় পদ্ধতিতে। একদল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনা করে। ভোটে পরাজিত দল বা দল সমূহ বিরোধী দলে থেকে সরকারের সমালোচনা করে।

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে বহু দল, মত ও ধর্মের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাপনা স্বীকৃত নয়। কেননা তাতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে।

ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা উম্মাহর দায়িত্বশীল বা খাদেম হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ কোন দলের লোক হন না।

(৭) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়।

পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন যোগ্যতা ও সক্ষমতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন ততদিন ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। যোগ্যতা হারালে বা অক্ষম প্রমাণিত হলে ঐ মুহূর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে। তাঁকে শাসন ক্ষমতায় বসানো বা প্রয়োজনে বিদায় করা শরীয়াতে আবশ্যক।

(৮) গণতন্ত্রে নেতাকে পদপ্রার্থী হতে হয়। নিজের যোগ্যতা ও গুণাবলীর ঘোষণা দিয়ে তাকে পদের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হয়।

অপরপক্ষে ইসলামে কেউ নেতৃত্ব বা পদ চাইলেই তিনি নেতৃত্ব দানের অযোগ্য বিবেচিত হন, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

(৯) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এক রকম নয়। অথচ এই শূরা ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশী যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

গণতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার প্রচেষ্টা :

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং তাদের কার্যপ্রণালী আর ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং কার্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করলেই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে আসমান-যমীন ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে।

গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, সৎ-অসৎ সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।

পক্ষান্তরে উম্মতের বাছাইকৃত সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়।

এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত নয়। কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বা মত গ্রহণ করা হতে পারে, কখনো সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতও গ্রহণ করা হতে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের চাইতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতামত বেশী কল্যাণকর মনে হয়। এমনকি ১০০ জন শূরা সদস্যদের মধ্যে ১ জন সদস্যের পরামর্শ বা মত যদি দলীল-প্রমাণ ও বিবেক-বিবেচনার অনুকূলে হয়, তাহলে সেটাই গ্রহণ করা হয়।

আবার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোন আইন তৈরী করতে পারে। তারা হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো বলে বিল পাশ করতে পারে, এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন।

পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায় এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিধানের বিষয়ে পুণর্বিবেচনা বা মতামত প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই। পরামর্শ করা হয় নতুন উদ্ভূত কোন সমস্যা বা বিষয় নিয়ে, যে বিষয়ে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করতে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন অন্য দ্বীন অন্বেষণ করতে।

সুতরাং কোন মুমিনের সুযোগ নেই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করার। সুযোগ নেই এ দ্বীনের মধ্যে কিছু সংযোজন, বিয়োজন কিংবা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার।

বড়ই আফসোসের বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর মুসলিমের মধ্যে ইসলামে সংযোজন-বিয়োজনের প্রবণতা।

আধুনিক কালের পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসী জোয়ারকে যৌক্তিক ভাবে মোকাবিলায় অক্ষম এক শ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদগণ মানব রচিত গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে আত্মীকরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আধুনিক বিশ্বে পশ্চিমা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের মুখোমুখি হয়ে মুসলিম সমাজের ই চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, আলেম এবং সমসাময়িক কিছু ইসলামী দলের মধ্যে একটি নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তা হলো, পশ্চিমা 'গণতন্ত্র'কে সরাসরি বর্জন না করে, তার ওপর ইসলামের একটি ধর্মীয় আবরণ চড়ানোর অপচেষ্টা করা। রাজনৈতিক পরিভাষায় একেই বলা হয় "গণতন্ত্রের ইসলামাইজেশন" বা "ইসলামী গণতন্ত্র"-র অবতারণা।

পশ্চিমা বিশ্বের কাছে নিজেদের 'প্রগতিশীল' ও 'গণতান্ত্রিক' হিসেবে প্রমাণ করার এবং আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামোয় টিকে থাকার এক আত্মঘাতী ও আপসকামী মানসিকতা থেকেই মূলত এই বিভ্রান্তিকর ধারণার জন্ম হয়েছে।

গত শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের জয়-জয়কার চলাকালে তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছিলেন, শুধু নাস্তিক্যবাদী চিন্তাটাকে বাদ দিলে সমাজতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই। সমাজতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত প্রমাণের জন্য তাঁরা 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষা চালু করেন।

বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে প্রভাব বিস্তার করে থাকা বিজাতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মতবাদ ‘গণতন্ত্র’ সম্পর্কেও একশ্রেণীর ইসলামী চিন্তাবিদ অনুরূপ ভাষ্য প্রদান করে,গণতন্ত্রকে মুসলিম বিশ্বে গ্রহণযোগ্য করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।

তারা বলছেন, শুধু “সার্বভৌমত্বের” প্রসঙ্গটি বাদ দিলে গণতন্ত্রকে ইসলামের মধ্যে গ্রহণে কোন সমস্যা নেই!

‘মাসিক পৃথিবী’ নভেম্বর ১৯৯১ সংখ্যায় বলা হয়েছে ‘ইসলাম ও গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে সেটি বাদ দিলে গণতন্ত্রের বড় বড় ৪টি পয়েন্টের সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই’।

ডঃ ইউসুফ আল-কারযাভী তাঁর Priorities of the Islamic Movement in the coming phase' গ্রন্থের 'The Movement and the Political Freedom and Democracy' শীর্ষক আলোচনায় গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে জোর ওকালতি করেছেন।

বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব ও চিন্তাবিদ শাহ আব্দুল হান্নান তাঁর ‘ইসলামের প্রেক্ষিতে গণতন্ত্র’ শীর্ষক প্রবন্ধে গণতন্ত্র বিরোধী ওলামায়ে কেরামদেরকে যুগ চাহিদার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রকে মেনে নেওয়ার আহবান জানান। তাঁর মতে, গণতন্ত্রকে গ্রহণ করলে পাশ্চাত্যে ইসলামের যে আগ্রাসী ও একনায়কত্ববাদী ভাবমূর্তি রয়েছে তা দূর হবে।

গণতন্ত্রকে ইসলাম সম্মত ও মুসলিম সমাজে গ্রহণযোগ্য করার জন্য তারা ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ পরিভাষা চালু করেছেন। অথচ গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, ইতিহাস, এর মূলনীতি ও আদর্শগুলোকে ইসলামী শরী‘আতের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, গণতন্ত্র একটি মানব রচিত শিরকী, কুফরী, জাহেলী মতবাদ। যা কখনো ইসলামের সাথে এক হবার নয়।

মানব রচিত এই মতবাদের কিছু বিষয়কে ইসলামাইজড করে গ্রহণ করা হলে, তা হবে দ্বীনের বিকৃতি সাধন বা গায়ের ইসলামকে দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করার শামিল, যা আল্লাহ তা‘আলা কখনো গ্রহণ করবেন না।

পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(সূরা আল ইমরান :৮৫ আয়াত)
“যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদেঅর দলভুক্ত।”

গণতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার জন্য সবচেয়ে বড় যে যুক্তিটি ব্যবহার করা হয়, তা হলো ইসলামের ‘শূরা’ বা পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থাকে পশ্চিমাদের ‘সংসদীয় গণতন্ত্র’-এর সমার্থক হিসেবে দাঁড় করানো।

তারা দাবি করেন, ইসলামে যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান নির্ধারণ বা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই বর্তমানের সংসদ বা পার্লামেন্ট হলো সেই শূরা ব্যবস্থারই আধুনিক রূপ।

কিন্তু এটি একটি চরম ধূর্ততাপূর্ণ তুলনা। ইসলামের শূরা বা পরামর্শ সভা কেবল আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে প্রশাসনিক বা কৌশলগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

শূরার কোনো সদস্য বা খলিফার এই অধিকার নেই যে, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আল্লাহর কোনো স্পষ্ট হারামকে হালাল করবে। অপরদিকে, গণতান্ত্রিক সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ এমপি বা সদস্য চাইলে যেকোনো শরিয়তবিরোধী আইন পাস করতে পারে।

সুতরাং, শারীয়ার অধীনস্থ ‘শূরা’ আর মানব-রচিত ‘সংসদ’ কখনো এক হতে পারে না।

এক্ষেত্রে ইসলামীকরণের পক্ষের লোকেরা প্রায়শই আরেকটি খোঁড়া যুক্তি দেন যে, গণতন্ত্র কেবলই একটি নিরপেক্ষ ‘পদ্ধতি’ বা নির্বাচন প্রক্রিয়া, যার সাথে আকীদার কোনো বিরোধ নেই।

তারা দাবি করেন, যদি একটি মুসলিম দেশে সৎ এবং দ্বীনদার মানুষ ভোটের মাধ্যমে সংসদে যায়, তবে তারা ইসলামের অনুকূলেই আইন তৈরি করবে। অতএব, এই পদ্ধতি ব্যবহারে কোনো বাধা নেই।

তবে এই যুক্তিটি-
তেতো ওষুধের ওপর মিষ্টি আবরণের মতো।

গণতন্ত্র কেবল কোনো সাধারণ ভোটদানের পদ্ধতি নয়; এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা , যার মূল কথাই হলো ‘জনগণের সার্বভৌমত্ব’। কোনো সৎ লোক সংসদে গেলেও তাকে সেই মানব-রচিত সংবিধানের অধীনেই শপথ নিতে হয় এবং নিজেকে আইনপ্রণেতা হিসেবে দাবি করতে হয়, যা আল্লাহর আইন প্রণয়নের একচ্ছত্র অধিকারের সাথে সরাসরি শিরক।

এই কৃত্রিম প্রচেষ্টার মাধ্যমে ‘ইসলামী রাষ্ট্র যেখানে শাসন ও বিচার চলে একমাত্র আল্লাহর আইনে, সেই চিরন্তন ধারণাকে হটিয়ে সেখানে ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ নামক একটি মিশ্র ও জগাখিচুড়ি ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

এটি মূলত পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ইসলামের একটি জোরপূর্বক আপস করানোর চেষ্টা, যার মূল উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমা বিশ্বকে আশ্বস্ত করা যে, মুসলমানরা খেলাফত বা শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় না, বরং তারা পশ্চিমাদের তৈরি করা ছকেই রাজনীতি করতে ইচ্ছুক।

এই মানসিকতা মুসলিম উম্মাহর মনস্তত্ত্ব থেকে খেলাফত পুনপ্রতিষ্ঠার বৈপ্লবিক চেতনাকে ধুলিসাৎ করে দেয় এবং সাধারণ মুসলিমদের মাঝে এক বিরাট বিভ্রান্তি তৈরি করে।
যখন বড় বড় ইসলামী চিন্তাবিদ বা দলগুলো গণতন্ত্রকে 'জায়েজ' বা 'ইসলামী' তকমা দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়, তখন সাধারণ মানুষ মনে করে এটি বুঝি ইসলামেরই একটি অংশ।

এর ফলে মানুষ অজান্তেই আল্লাহর দেওয়া নিখুঁত শাসনব্যবস্থার চেয়ে মানুষের তৈরি এই কুফরি ব্যবস্থার প্রতি বেশি আস্থাশীল হয়ে পড়ে, যা ঈমান হরণের এক নীরব হাতিয়ার। অতএব, গণতন্ত্রকে ইসলামাইজেশন করার যেকোনো প্রচেষ্টা মূলত তেল আর পানিকে এক করার নিষ্ফল চেষ্টার শামিল।

কুফরি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি মানব-রচিত মতবাদকে কখনো ইসলামের লেবাস পরিয়ে হালাল করা সম্ভব নয়। বরং এটি ইসলামের মূল চেতনাকে বিকৃত করে পশ্চিমাদের গোলামী করার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক পরাজয় মাত্র।

গণতন্ত্রের অপর নাম ধোকাতন্ত্র :

বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সুকৌশলী বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতারণার নাম হলো গণতন্ত্র।

পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো বছরের পর বছর ধরে অত্যন্ত সুচারুভাবে এই মিথ্যা বলে আসছে যে, গণতন্ত্র মানেই হলো জনগণের মুক্তি, বাকস্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের চূড়ান্ত রক্ষাকবচ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা এবং তাদের সাথে এক নিরন্তর মনস্তাত্ত্বিক প্রহসনের ওপর।এই ধোকাতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ফাঁদ হলো 'জনগণের সার্বভৌমত্ব'। কিন্তু বাহ্যিক চাকচিক্য এর পেছনের বাস্তবতাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে যে নির্লজ্জ সত্যটি বেরিয়ে আসে, তা হলো, গণতন্ত্র মূলত কোনো স্বাধীন শাসনব্যবস্থা নয়, বরং এটি নব্য-উপনিবেশবাদ এবং পুঁজিবাদের মোড়কে আবৃত একটি সুপরিকল্পিত 'ধোকাতন্ত্র'।

গণতন্ত্রে আদৌ জনগণের মতামতের কোনো মূল্য আছে কি না, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো ইরাক যুদ্ধ। ইংল্যান্ড ও ইতালি সহ পুরো ইউরোপ জুড়ে যখন ইরাক যুদ্ধের বিপক্ষে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন ইংল্যান্ডে প্রায় পঁচিশ লক্ষ এবং ইতালিতে পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমেছিল।

বিভিন্ন জরিপেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কিছু ক্ষেত্রে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই এই যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। কিন্তু এত কিছুর পরও পশ্চিমা শাসকরা সেই জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যুদ্ধে জড়িয়েছিলো। এই হলো তথাকথিত গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রকৃত মূল্য।

সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয় যে, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস তারা এবং একটি ব্যালট পেপারের মাধ্যমেই তারা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে

নির্বাচনের মাঠে সাধারণ জনতার সামনে যে বিকল্পগুলো দাঁড় করানো হয়, তা আগে থেকেই ক্ষমতাধর শ্রেণী, পুঁজিপতি এবং বিদেশি পরাশক্তিদের দ্বারা নির্ধারিত।

অর্থাৎ, জনগণ কেবল সেই সব প্রার্থীদের মধ্য থেকেই একজনকে বেছে নেওয়ার 'স্বাধীনতা' পায়, যাদেরকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদের সামনে উপস্থাপন করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রকৃত ক্ষমতা কখনোই জনতার হাতে থাকে না; তা থাকে কর্পোরেট সিন্ডিকেট, মিডিয়া মোগল এবং আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে।

পাঁচ বছর পর পর উৎসবের আমেজে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো মূলত দাসত্বের শৃঙ্খলকে নবায়ন করার একটি আনুষ্ঠানিক ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নির্বাচনি সমীকরণে জনগণের ইচ্ছার পরাজয়-

গণতন্ত্রে অধিকাংশ জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন কীভাবে ধাপে ধাপে ধূলিসাৎ হয়, তা নির্বাচনের মাঠের একটি গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়:

১. প্রতিনিধি নির্বাচনে সংখ্যালঘুর জয়:

যদি একটি নির্বাচনি এলাকায় মোট ভোটার ৫০,০০০ জন এবং প্রার্থী তিনজন। নির্বাচনে প্রথমজন ১৬,০০০ ভোট, দ্বিতীয়জন ১৮,০০০ ভোট এবং তৃতীয়জন ১৪,০০০ ভোট পেলেন। বাকি ২,০০০ জন ভোটদানে বিরত থাকলেন। এখানে বিজয়ী হলেন দ্বিতীয়জন, যিনি ৫০,০০০ ভোটের মধ্যে পেয়েছেন মাত্র ১৮,০০০ ভোট (অর্থাৎ মাত্র ৩৬%)।
তাহলে প্রশ্ন হলো, বাকি ৬৪% মানুষের ইচ্ছার কী হবে? একজন ব্যক্তি মাত্র ৩৬% ভোট পেয়ে ১০০% মানুষের প্রতিনিধি হয়ে গেলেন! এটিকে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতিফলন বলা হয়, তবে তা এক নিরেট ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

২. সরকার গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠের বঞ্চনা:

মনে করি,, একটি দেশের সংসদে মোট সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। এর মধ্যে ৫০ জন সংরক্ষিত আসনের এবং বাকি ৩০০ জন সরাসরি নির্বাচিত। নিয়ম অনুযায়ী, যে দলের সংসদ সদস্য বেশি, তারাই সরকার গঠন করবে।একটি দল ৫১% আসন পেয়ে (অর্থাৎ ১৭৬ জন সদস্য নিয়ে) সরকার গঠন করল।

এর অর্থ হলো, বাকি ১৭৪ জন সাংসদ সরকার গঠন প্রক্রিয়া থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ে গেলেন। এমন হওয়াও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, বাদ পড়া এই ১৭৪ জন সাংসদ যে পরিমাণ সাধারণ ভোটারের ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, সরকার গঠনকারী ১৭৬ জন সাংসদের মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা তার চেয়েও কম।

৩. সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন:

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সাংসদদের ভোটে। অর্থাৎ, ওই ১৭৬ জন সাংসদের মধ্যে ৮৯ জন যদি কাউকে সমর্থন করেন, তবে তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। অথচ দেখা যেতে পারে, এই ৮৯ জন সাংসদ সাধারণ জনগণের কাছ থেকে যে ভোট পেয়েছেন, বাকি ৮৭ জন সাংসদের প্রাপ্ত ভোট তার চেয়েও অনেক বেশি। এখানে জনগণের ইচ্ছার সাথে আবারও প্রতারণা করা হলো।

৪. নীতি নির্ধারণে জনমতের ক্রমাবনতি:

অনেকে যুক্তি দিতে পারেন যে, যদি জনগণের ভোটেই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হন, তবে নীতি নির্ধারণে তো তাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটার কথা। বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে পরিষ্কার করা যাক:

একটি দেশের ৫১% ভোটার তিনটি নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে সোচ্চার: তারা চায় লিচুকে জাতীয় ফল, ক্রিকেটকে জাতীয় খেলা এবং পেঁচাকে জাতীয় পাখি হিসেবে ঘোষণা করা হোক।

কিন্তু তারা নির্বাচনের মাঠে এমন কোনো প্রার্থী পেল না, যে তিনটি দাবিই সমর্থন করে। বাধ্য হয়ে তারা এমন প্রার্থীকে ভোট দিল, যে লিচু ও ক্রিকেটের পক্ষে, কিন্তু পেঁচার বিপক্ষে (অর্থাৎ, দুই-তৃতীয়াংশ মতের মিল)।

নির্বাচনের পর যখন প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা গঠনের সময় এলো, তখন দেখা গেল রাজনৈতিক মেরুকরণের কারণে সাংসদদের নিজেদের মতও পাল্টে গেছে। দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এমন একজনকে দাঁড় করানো হলো, যিনি কেবল 'লিচুকে জাতীয় ফল' করার পক্ষে, বাকি দুটির ঘোর বিরোধী। অগত্যা সাংসদরা তাকেই প্রধানমন্ত্রী বানালেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিসভা গঠন করলেন এমন লোকদের নিয়ে, যাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি এই একটি দাবিরও বিপক্ষে অবস্থান নিল।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে জনগণ তিনটি দাবি নিয়ে ভোট দিতে গিয়েছিল, দিনশেষে তাদের ইচ্ছের মাত্র ৩৩%-ও সরকার পর্যন্ত পৌঁছাল না। কিন্তু জনগণ কখনোই চায়নি তাদের মতামত এভাবে খণ্ডিত বা বাতিল হোক। অর্থাৎ, গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা প্রতিফলিত হওয়ার দাবিটি ১০০% একটি ডাহা মিথ্যা।

৫. অর্থনীতির মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ :

গণতন্ত্রের এই প্রতারণাপূর্ণ চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নির্বাচনের সময়। আধুনিক গণতান্ত্রিক নির্বাচন মানেই হলো হাজার কোটি টাকার এক নোংরা খেলা। এখানে মেধা, সততা, তাকওয়া বা দেশপ্রেমের কোনো মূল্য নেই; বরং এখানে চূড়ান্ত বিজয়ী হয় কালো টাকা আর পেশিশক্তি।

একজন সৎ ও আদর্শবান মানুষের পক্ষে এই মিলিয়ন ডলারের নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়া বা মিডিয়ার সমর্থন কেনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ফলে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে।

৬. মিডিয়া ও গবেষণায় ধোঁকাতন্ত্রের প্রমাণ-

গণতন্ত্র যে একটি ধোঁকাতন্ত্র, এই বাস্তবতা মূলধারার গণমাধ্যমে খুব একটা আসে না। কারণ যারা এই ধোঁকাবাজির নিয়ন্ত্রক, গণমাধ্যমও তাদেরই হাতের পুতুল। তারপরও

মাঝে মাঝে সত্য বেরিয়ে আসে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসি-তে প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয়েছে -

"প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মার্টিন গিলেনস ও নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বেঞ্জামিন আই পেইজের এক দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণি এবং সংঘবদ্ধ বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষায় সরকারকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ, খোদ যুক্তরাষ্ট্রও পরিচালিত হয় ধনী ও ক্ষমতাবানদের দ্বারা। সাধারণ জনগণ সর্বক্ষেত্রে কেবল উপেক্ষিতই হয়।"
গণতন্ত্রের সূতিকাগার যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থাই যদি এমন হয়, তবে বাংলাদেশের মতো দেশের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণা সংস্থা 'পিউ রিসার্চ সেন্টার'-এর একটি জরিপে উঠে এসেছে যে, বাংলাদেশের ৬৯% মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, "সরকার জনগণের কথা একেবারেই শোনে না।"

নির্বাচনের আগে নেতারা জনগণের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে যেসব আকাশকুসুম প্রতিশ্রুতি দেন, নির্বাচনের পরের দিনই তা কর্পোরেট স্বার্থের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ কেবল ভোট দেওয়ার দিনটিতে নিজেদের 'রাজা' ভাবার এক অদ্ভুত আত্মতুষ্টিতে ভোগে, আর পরদিন থেকেই শুরু হয় তাদের ওপর নতুন করে শোষণের পালা।

আদর্শিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গণতন্ত্র এক ভয়াবহ ধোঁকার নাম, বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর জন্য। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত চতুরতার সাথে মানুষের মনস্তত্ত্ব আল্লাহর আইনের প্রতি আনুগত্যকে মুছে ফেলে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়ে এখানে এমন এক অবস্থা এখন তৈরি করা হয়, যেখানে মানুষ মনে করে তারা যদি অধিকাংশের ভোটে কোনো হারাম বা অন্যায়কে বৈধতা দেয়, তবে সেটাই সঠিক। এর ফলে সুদের বৈধতা, মদের লাইসেন্স, অশ্লীলতা এবং সমকামিতার মতো জঘন্য অপরাধগুলোও গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে আইনি স্বীকৃতি পেয়ে যায়।
মূলত সমান অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে গণতন্ত্র সমাজ থেকে নৈতিকতার শিকড় উপড়ে ফেলে এবং ধর্মকে কেবল ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে

সীমাবদ্ধ করে দেয়। এটি এমন এক ধোকাতন্ত্র, যা মানুষকে নিজেদের অজান্তেই শিরক ও কুফরের দিকে ধাবিত করে।

পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর কপটতা ও দ্বিমুখী নীতি গণতন্ত্রের এই ধোঁকাবাজিকে আরও বেশি নগ্ন করে দেয়। তারা সারা বিশ্বে গণতন্ত্রের ফেরিওয়ালা সেজে অন্য দেশগুলোতে হস্তক্ষেপ করে, অথচ তাদের এই গণতন্ত্রের মাপকাঠি নির্ধারিত হয় নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে। যখনই কোনো মুসলিম দেশে ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হতে যায়, তখনই পশ্চিমাদের আসল রূপ বেরিয়ে আসে। আলজেরিয়া থেকে শুরু করে মিশর- ইতিহাস সাক্ষী যে, নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা মুহূর্তের মধ্যে এই 'গণতন্ত্র'-এর গলা টিপে হত্যা করে সামরিক স্বৈরশাসকদের সমর্থন দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাদের কাছে গণতন্ত্র কেবল তখনই বৈধ, যখন তা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং তাদের তাগুতী বিশ্বব্যবস্থার গোলামি নিশ্চিত করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, গণতন্ত্র নামক নব্য জাহেলি ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জনগণকে দেওয়ার বুলিটি একটি চরম প্রতারণা মাত্র। বাস্তবতা হলো, সকল ক্ষমতা মুষ্টিমেয় নেতা ও এলিট শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত থাকে, ঠিক যেমনটি প্রাচীন জাহেলি সমাজব্যবস্থায় দেখা যেত।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এই জাহেলি মানসিকতা সম্পর্কে ইরশাদ করেন:

আল-আন‘আম ৬:১৩৭

ۖ وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ

"আর এভাবেই অনেক মুশরিকের জন্য তাদের উপাস্যরা তাদের সন্তানদের হত্যা করাকে শোভনীয় করে দিয়েছে, যাতে তারা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সংশয়পূর্ণ করতে পারে।" (সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১৩৭)

এই আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম রাজী (রহ.) উল্লেখ করেন:

"আল্লামা কালবী (রহ.) বলেন, কাফিরদের উপাস্যদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সেবকদল ছিল, যারা কাফিরদের নিকট নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের হত্যা করাকে সুশোভিত করে দেখাত।"

ঠিক একইভাবে, বর্তমান যুগের তাগুতী শক্তিগুলো সাধারণ মানুষের সামনে গণতন্ত্র নামক এই ধোঁকাবাজিকে মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে সুশোভিত করে উপস্থাপন করছে। অথচ আল্লাহর দেওয়া নিখুঁত জীবনবিধান ব্যতীত সকল মানব-রচিত ব্যবস্থাই হলো জাহেলিয়াত ও মূর্খতা। তাই প্রকৃত মুক্তি ও ইনসাফ পেতে হলে মানব-রচিত এসব জাহেলিয়াতকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথেই ফিরে আসতে হবে।যতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ এবং বিশ্বের মজলুম মানুষ পশ্চিমা রচিত এই ধোকাতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ না হবে, ততদিন এই শোষণের যাঁতাকল চলতেই থাকবে।

আকাবিগণের অভিমত :

১. শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ, বলেন-

ولما كانت المدينة ذات اجتماع عظيم لا يمكن ان يتفق رأيهم جميعا على حفظ السنة العادلة

“অর্থাৎ, যেহেতু একটি শহর মানব সমাজের একটি বড় সমাবেশস্থল এবং সেখানে বিভিন্ন মতাদর্শের লোকের বসবাস রয়েছে, তাই সেখানে তাদের সকলের ইসলামী আদর্শ সংরক্ষণের ব্যাপারে একমত হয়ে যাওয়া অসম্ভব একটি ব্যাপার।”

বোঝা গেলো যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা- যা অধিকাংশের ঐকমত্যের ভিত্তিতে পরিচালিত; তাই এর মাধ্যমে ইসলামী আইন-কানুন এবং মুসলমানদের উন্নতি ও সফলতা প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব নয়।

২. হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন-

غرض اسلام میں جمہوری سلطنت کوئی چیز نہیں .یہ مخترعہ متعارفہ جمہوریت محض گھڑا ہوا ڈھکوسلہ ہے، بالخصوص ایسی جمہوری سلطنت جو مسلم و کافر ارکان سے مرکب ہو وہ تو غیر مسلم سلطنت ہی ہوگی.

“অর্থাৎ, মোটকথা, ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কিছু নেই ....এই নবআবিষ্কত প্রচলিত গণতন্ত্র শুধু মনগড়া প্রতারণা। বিশেষত এমন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, যা মুসলিম এবং কাফির সদস্যদের নিয়ে গঠিত। একে অমুসলিম শাসনব্যবস্থাই বলতে হবে।”

৩. মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী রহ. বলেন-

لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مزدور اور عوام کی حکومت ہے، ایسی حکومت بلاشبہ حکومت کافرہ ہے-

অর্থাৎ, “ঐসব লোক একথা বলে যে, এটি জনসাধারণ এবং শ্রমিক মজদুরদের রাষ্ট্র। যদি এমনই হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি একটি কুফরী রাষ্ট্র।”

৪. হাকীমুল ইসলাম কারী তায়্যিব রহ. বলেন-

یہ)جمہوریت (رب تعالی کی صفت ملکیت میں بھی شرک ہے اور صفت علم میں بھی شرک ہے-

অর্থাৎ, “এই গণতন্ত্র আল্লাহ তা'আলার বাদশাহি এবং তাঁর ইলম ও গুণের মধ্যে শিরক।”

৫. মুফতী রশীদ আহমাদ লুধইয়ানবী রহ. বলেন,

یہ تمام برگ و بار مغربی جمہوریت کے شجرہ خبیثہ کی پیداوار ہے- اسلام میں اس کافرانہ انتظام کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی- اس طریقے سے قیامت تک اسلامی نظام آسکتا ہیں.

অর্থাৎ, “বিশ্বময় অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খলাময় এ পরিবেশ পশ্চিমা গণতন্ত্রের নিকৃষ্ট বৃক্ষের ফসল। ইসলামের মধ্যে এ ধরণের কুফরী ব্যবস্থাপনার কোনোই অবকাশ নেই। আর না এ পদ্ধতিতে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হতে পারবে।"

৬. মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী শহীদ রহ. বলেন,
جمہوریت کا نہ صرف یہ کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اسلام کے سیاسی نظریے کی ضد ہے

অর্থ: "গণতন্ত্র কেবল ইসলামের সাথে সম্পর্কহীনই নয়; বরং তা ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার একেবারে বিপরীত।

৭. মাওলানা সাইয়্যেদ মুহসিন শাহ বুখারী রহ. বলেন,
اگر کسی ایک قبر کو مشکل کشا مانا شرک ہے تو کسی اور نظام ریاست، اپریل دوم ڈیمو کریسی، کمیونزم، کیپٹل ازم اور تمام باطل نظام ہائے ریاست کو مانا کیسے اسلام ہو سلام ہے؟۔ قبر کو سجدہ کرنے والا مشرک، پتھر لکڑی اور درخت کو مشکل کشا ماننے والا، حاجت روا ماننے والا مشرک، اور غیر اللہ کے نظاموں کو مرتب کرنا اور اس کے لئے تگ و دو کرنا اور اس نظام کو قبول کرنا، یہ توحید ہے ؟ کہاں ،ہے جمہوریت اسلام میں ؟ نہ روٹ ہے نہ مفاہمت ہے، نہ ان کا وجود برداشت ہے نہ ان کا تہذیب برداشت ہے۔ اسلام آپ سے اطاعت مانگتا ہے۔ آپ سے ووٹ نہیں مانگتا، آپ کی رائے نہیں مانگتا ۔)من يُطِعِ الرَّسُولَ ر اطاع اللہ النساء :80

অর্থ: "যদি কোনো মুসলমানের জন্য মাজারকে অসুবিধা নিরসনকারী বলে মানা শিরক হয়, তাহলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেমন ইম্পেরিয়ালিজম, ডেমোক্রেসী, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম এবং সকল ভ্রান্ত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মেনে নেয়া কিভাবে ইসলাম সম্মত হতে পারে? কবর পূজারী, সেজাদকারী মুশরিক, পাথর, লাকড়ী এবং বৃক্ষ-লতাকে বালা মসিবত বিদূরণকারী, প্রয়োজন পূরণকারী বলে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা যদি মুশরিক হয় তাহলে গায়রুল্লাহর আইনসমূহকে সাজানো এবং তার জন্য শ্রম দেওয়া এবং এই আইনকে গ্রহণ করা তাওহীদ হয় কী করে?”

৯. প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মুফতী হামিদুল্লাহ জান সাহেব দা. বা. তাঁর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফতওয়ার মধ্যে বলেন-

مشاہدہ اور تجربے سے ثابت ہے کہ موجودہ مغربی جمہوری نظام ہی بے دینی، بے حیائی اور تمام فسادات کی جڑ ہے اور خصوصاً اس میں اسمبلیوں کو حق تشریع آئین سازی، قانون سازی کا حق دینا سراسر کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف) ہے ...اور ووٹ کا استعمال مغربی جمہوری نظام کو عملا تسلیم کرنا اور اس کی تمام خرابیوں میں حصدار بننا ہے، اس لئے موجودہ مغربی جمہوری نظام کے تحت ووٹ کا استعمال شرعاً نا جائز ہے.

অর্থ: "বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, বর্তমান কালের পশ্চিমা গণতন্ত্রই সকল কাজের বদদ্বীনী নির্লজ্জতা এবং সকল অন্যায় অবিচারের মূল। বিশেষ করে এতে পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে আইন প্রণয়নের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টভাবে কুরআন সুন্নাহ এবং উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। ভোটে অংশ নেওয়া, পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যত মেনে নেওয়া এবং তার সকল প্রকার নষ্টামী ও অপকর্মের মধ্যে অংশ নেওয়ার নামান্তর। এটা এজন্য যে বর্তমানে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় ভোট প্রয়োগ শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণরূপে হারাম।"

১০. মাওলানা ফযলে মুহাম্মাদ রহ. বলেন:

اسلامی شرعی شوری اور موجودہ جمہوریت کے درمیان اتنا فرق ہے جتنا آسمان او رزمین میں ، وہ مغربی آزاد قوم کی افراتفری کا نام ہے۔ جس کا شرعی شورائی نظام سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔

অর্থাৎ, "ইসলামী শরীয়তের শূরাব্যবস্থা আর বর্তমানের গণতন্ত্রের মাঝে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। গণতন্ত্র তো পাশ্চাত্যের স্বাধীন জাতির বিশৃঙ্খলময় একটি ব্যবস্থা মাত্র, যার সাথে ইসলামী শরয়ী শূরার দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।"

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের বিধান :

ইসলামী শরীয়তের 'উসুলুত তাকফীর' অর্থাৎ কাফির সাব্যস্ত করার মূলনীতি এবং 'মাওয়ানিউত তাকফীর' অর্থাৎ তাকফীরের প্রতিবন্ধকতা -এর ওপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা অনুযায়ী, কোনো কুফরি বা শিরকি কাজে লিপ্ত হলেই সরাসরি কাউকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ না তার ওপর হুজ্জত বা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার ক্ষেত্রে তাকফীরের প্রতিবন্ধকগুলো দূর হয়।

নিচে প্রতিটি ভাগের স্বপক্ষে কোরআন, সুন্নাহ এবং সালাফদের ফতোয়া থেকে দলিল তুলে ধরা হলো:

১. বিশ্বাসগত অংশগ্রহণ (প্রকৃত কাফির)

যারা জেনেশুনে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, আইন প্রণয়নের অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের এবং তারা চাইলে আল্লাহর আইনের পরিপন্থী আইনও (যেমন: সুদ, মদ, পতিতাবৃত্তি বৈধ করা) পাস করতে পারে, তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এর দলিল হলো:
কুরআনুল কারিম হতে,
আল-মা'ইদাহ ৫:৪৪

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۟

“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।” (সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ৪৪)

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۟
“তাদের কি এমন কিছু শরিক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন (আইন বা জীবনব্যবস্থা) প্রণয়ন করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?"
(সূরা আশ-শূরা, আয়াত: ২১)

হাদিস হতে দলিল:

আদি ইবনে হাতিম (রা.)-এর সেই বিখ্যাত হাদিস, যেখানে রাসূল (ﷺ) খ্রিস্টান পোপ ও যাজকদের দ্বারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার নীতি মেনে নেওয়াকে 'তাদের ইবাদত করা' বা শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।
(সুনান আত-তিরমিযী: ৩০৯৫)

২. অজ্ঞতাবশত অংশগ্রহণ (জাহল বা العذر بالجهل)

যারা জানেন না যে এটি একটি শিরকি ব্যবস্থা; বরং দুনিয়াবী কোনো স্বার্থে, প্রলোভনে বা নিছক না বুঝে ভোট দেয়, তাদের ওপর তাকফীর (কাফির ফতোয়া) প্রয়োগ করা যাবে না। ইসলামে 'অজ্ঞতা' বা জাহল একটি বড় ওজর হিসেবে গণ্য। কোরআনের দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰي نَبْعَثَ رَسُوْلًا

"আর আমি কোনো রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত (তথা সত্যের বাণী পৌঁছানোর আগে) কাউকেই শাস্তি দিই না।"
(সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১৫)

হাদিস হতে দলিল (যাতু আনওয়াত-এর ঘটনা):

হুনাইনের যুদ্ধের সময় কিছু নতুন মুসলিম সাহাবী একটি বরই গাছ দেখে রাসূল (ﷺ)-এর কাছে আবদার করেছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুশরিকদের যেমন একটি 'যাতু আনওয়াত' (অস্ত্র ঝুলিয়ে বরকত নেওয়ার গাছ) আছে, আমাদের জন্যও তেমন একটি নির্দিষ্ট করে দিন।" এটি ছিল সরাসরি শিরকের আবেদন। কিন্তু যেহেতু তারা ছিলেন নবদীক্ষিত মুসলিম এবং বিষয়টির হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, তাই রাসূল (ﷺ)

তাদেরকে কাফির না বলে তাদের ভুল ভেঙে দিয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহু আকবার! তোমরা তো মূসা (আ.)-এর কওমের মতোই কথা বললে..."
(সুনান আত-তিরমিযী: ২১৮০)

ব্যাখ্যা

এই হাদিস প্রমাণ করে, অজ্ঞতাবশত কেউ কুফরি কথা বললেও সরাসরি তাকে কাফির বলা যায় না, যতক্ষণ না তাকে সত্যটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

৩. ভুল ব্যাখ্যার শিকার (তাবীল বা التأويل)

যারা কোরআন-সুন্নাহর কোনো ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়ে অথবা কোনো আলেমের ফতোয়ায় বিভ্রান্ত হয়ে ভোট দেয় (যেমন: ভোট দেওয়াকে 'আমানত', 'শূরা' বা 'সাক্ষ্য প্রদান' মনে করে), তারাও কাফির হবে না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য কুফরি করা নয়; তারা মনে করছে তারা ইসলামের একটি নির্দেশ পালন করছে।

কোরআনের দলিল:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۚ

"তোমরা ভুলবশত যা করে ফেলো, সে জন্য তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় সংকল্প করে (তার হিসাব নেওয়া হবে)।"
(সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫)

হাদিসের দলিল :

ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে বদরী সাহাবী কুদামাহ ইবনে মাজউন (রা.) মদ পান করেছিলেন। তিনি সূরা মায়িদাহর ৯৩ নং আয়াতের একটি ভুল ব্যাখ্যা করে মনে করেছিলেন যে, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তাদের জন্য মদ পানে কোনো দোষ নেই।

ওমর (রা.) এবং আলী (রা.) এই ভুল ব্যাখ্যার কারণে তাঁকে কাফির ফতোয়া দেননি বা ধর্মত্যাগী হিসেবে হত্যা করেননি; বরং তাঁর ভুল ধারণা ভেঙে দেওয়ার পর তাঁকে কেবল মদ পানের সাধারণ শাস্তি (হদ) দিয়েছিলেন।
(তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা মায়িদাহ: ৯৩-এর ব্যাখ্যায়)*

উপরোক্ত দলিলগুলোর ভিত্তিতেই আহলুস সুন্নাহর আলেমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক কাঠামো একটি কুফরি ও শিরকি ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, এর সাথে জড়িত সাধারণ জনগণকে ঢালাওভাবে কাফির বলা যাবে না। তাদের ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা, জ্ঞান ও উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে শরয়ী হুকুম ভিন্ন হবে।

খিলাফাতের বিলুপ্তি :

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উসমানীয় খিলাফতের যখন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পতন শুরু হয়, ঠিক সেই সুযোগে পশ্চিমারা তাদের মিশনারিগুলোর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে তীব্র সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালায়।

ইউরোপে তখন রেনেসাঁ বা নবজাগরণের উদ্ভব ঘটেছে, আর অন্যদিকে উসমানীয় খিলাফত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। খিলাফতের এই পতনের পেছনে বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক কারণ ছিল।

◑ মুসলমানরা ব্যাপকভাবে আরবি ভাষার চর্চা ছেড়ে দেওয়ায় সমকালীন বিষয়গুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যার ফলে তাদের মধ্যে বিভ্রান্তিকর ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে।

◑ একশ্রেণির মানুষের মাঝে এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয় যে, যুগের সাথে তাল মেলাতে ইসলামের আইন-কানুনকেও আধুনিকায়ন বা ‘আপগ্রেড’ করা প্রয়োজন।

◑ ইসলামে যেসব বিষয় সরাসরি নিষেধ করা হয়নি, সেগুলোকে নির্বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা শুরু হয়।

◑ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা যেহেতু ‘আহলে কিতাব’, তাই তাদের সাথে সম্পর্ক উষ্ণ রাখা যাবে, এমন একটি আত্মঘাতী ও আপসকামী মানসিকতাও সে সময় মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম উম্মাহ ৬৫৬ হিজরিতে এমন চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, যা ইসলামের ইতিহাসকে কলঙ্কিত ও ভারী করে তুলেছে।

৬৫৬ হিজরিতে তাতারীদের ভয়ংকর আক্রমণে যখন বাগদাদের ইসলামী খিলাফতের পতন ঘটে, তখন হালাকু খান ইসলামী শাসন ধ্বংস করে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে চেঙ্গিস খানের রচিত ‘ইয়াসিক’ বা ‘ইয়াসা’ নামক মানব-রচিত কুফরি সংবিধান মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়।

সে যুগের হক্কানি উলামায়ে কেরাম এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসী ও চূড়ান্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, যারা এই ‘ইয়াসা’ সংবিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করবে বা এর কাছে বিচার প্রার্থনা করবে, তারা সকলেই কাফির হয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.) অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "যে ব্যক্তি সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ওপর নাজিলকৃত শরিয়তকে বর্জন করে অন্য কোনো রহিত বা বাতিল আইন অনুযায়ী বিচার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।

সুতরাং যারা ‘ইয়াসা’ নামক মানব-রচিত সংবিধান অনুযায়ী বিচার করে এবং আল্লাহর শরিয়তের ওপর তাকে প্রাধান্য দেয়, উম্মাতে মুসলিমার সর্বসম্মত ঐকমত্যে এমন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির।

উলামায়ে কেরামের এই আপসহীন ফতোয়ার পর যখন সকল মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে 'ইয়াসা' সংবিধানের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিল, তখন উপায়ান্তর না দেখে তাতারী শাসক মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য দুটি সমান্তরাল আদালত চালু করার প্রস্তাব করেছিল; যার একটি পরিচালিত হবে তাদের কুফরি 'ইয়াসা' সংবিধান অনুযায়ী, আর অপরটি চলবে কুরআন-সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী।

ইসলামী শাসনব্যবস্থায় একজন খলিফা মূলত আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

তাই পৃথিবীতে যতদিন ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল এবং বর্তমানেও যখনই এর দাবি তোলা হয়, তা পশ্চিমা কুফফার গোষ্ঠীর কাছে এক ভয়ানক হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা তাদের আরাম-আয়েশ ও আধিপত্য গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এই আতঙ্কের কারণেই বিশ্ব কুফফার জোট দীর্ঘ তিন যুগ ধরে ইসলামের সুউচ্চ প্রাসাদকে ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
অবশেষে, ১৯২২ সালের নভেম্বর থেকে ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের প্রতিনিধি ইসমত ইনোনু এবং ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জনের মাঝে অনুষ্ঠিত 'লুজান চুক্তি'-র মাধ্যমে তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছায়।

এই চুক্তির ভিত্তিতেই ১৯২৪ সালের ৩ মার্চ মুসলিম জাতির চরম গাদ্দার আতাতুর্কের মাধ্যমে ইসলামের সর্বশেষ খিলাফতের পতন ঘটানো হয়।

খিলাফত ধ্বংসের এই নীলনকশায় তারা প্রধানত চারটি শর্তে একমত হয়েছিল -

১. ইসলামী খিলাফাহকে বিলুপ্ত করতে হবে।
২. খিলাফাহ পুনঃপ্রত্যাবর্তনের যেকোনো প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে হবে।
৩. ইসলামী নিদর্শন ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।
৪. ইসলামী শরীয়াহর পরিবর্তে পশ্চিমা মানবরচিত আইন-কানুন চালু করতে হবে।

আল্লাহর নিখুঁত জীবনবিধানকে উৎপাটিত করে সেখানে মানব-রচিত কুফরি আইন প্রবর্তন করা মানব ইতিহাসের এক ভয়ংকর ও জঘন্যতম অপরাধ, যা প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য, সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের হৃদয়ে এক তীব্র আঘাত হেনেছে।

খিলাফত ধ্বংস করেই তাগুত শক্তি ক্ষান্ত হয়নি; ভবিষ্যতে ইসলাম যেন আর কখনোই তাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে না পারে, সে লক্ষ্যে তারা সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জাল বোনে এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈশ্বিক ঐকমত্যে পৌঁছায়।

১. যে কেউ ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রতি জাতিকে আহ্বান করবে, তাকে সমূলে উৎখাত করতে হবে।

২. বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যেকোনো ধরনের ইসলামী জাগরণকে ঠেকাতে হবে।

৩. জিহাদ নামক বিধানকে এবং এর পরিভাষাসমূহকে গুলিয়ে ফেলতে হবে। জঙ্গীবাদ, বর্বরতা ও সেকেলে বলে প্রচারণা চালানো এবং সর্বাত্মকভাবে এর উপর সম্ভাব্য সকল পন্থায় হামলা চালাতে হবে। সর্বোপরি মানুষের সামনে এই বলে প্রচারণা করতে হবে যে, এটা মানুষের কল্যাণ উপযোগী নয়; বরং এটা বন্য ও জংলীদের জন্যেই যথাযোগ্য।

৪. ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পচা, দুর্গন্ধময় জলাভূমিতে চুবিয়ে রাখা, যেন তারা এভাবে থাকতে থাকতে একদিন কামাসক্ত ও লজ্জাহীন জানোয়ারে পরিণত হয়। অবশেষে তাদের মাঝে শুধু খেয়ালখুশি আর কামভাব ছাড়া কিছুই থাকবে না।

৫. সব ধরনের সংস্তা, সংগঠন, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অধিকার থেকে বের করে আনা। বিশেষ করে নিরাপত্তা বিভাগ সেনাবাহিনী প্রচার মাধ্যম পররাষ্ট্র বিষয়ক সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ। যার ফলে সকল ক্ষেত্রে অমুসলিমদের এক ছাত্র অধিপত্য থাকবে। এগুলোর উপর মুসলিমদের সামান্যতম কর্তৃত্ব থাকবে না

মূলত এই গভীর ষড়যন্ত্রের কারণেই আজ বিশ্বজুড়ে ইসলামী জাগরণ ও মুজাহিদদের ওপর এত দমন-পীড়ন এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর দ্বারা অব্যাহত নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ইসলামী শাসন/ খিলাফত ব্যবস্থা হারিয়ে মুসলমানদের অবস্থা :

খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কেবল কোনো রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না, বরং তা ছিল সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আকিদা, ঐতিহ্য, ঐক্য ও নিরাপত্তার এক অভেদ্য দুর্গ। **১৯২৪** সালে উসমানী খিলাফত ধ্বংসের মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের সেই ঐশী ঢালটি হারিয়ে ফেলে, যার ফলে বিশ্বমঞ্চে উম্মাহর রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্বের অবসান ঘটে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"ইমাম বা খলিফা হলেন ঢালস্বরূপ, যার পেছনে থেকে লড়াই করা হয় এবং যার দ্বারা নিরাপত্তা লাভ করা হয়।"

আজ সেই ঐশী ঢাল না থাকার কারণেই মুসলিম উম্মাহ এক অরক্ষিত ও পিতৃহীন এতিম জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা যেন এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে দিকভ্রান্ত নাবিকের মতো, যার না আছে কোনো শক্ত নোঙর, আর না আছে নিজেদের রক্ষা করার মতো কোনো শক্ত ভিত্তি।

ইসলামী শাসনব্যবস্থা ছাড়া মুসলমানদের সবচেয়ে দৃশ্যমান ও মর্মান্তিক পরিণতি হলো তাদের জানমালের চরম নিরাপত্তাহীনতা এবং বিশ্বজুড়ে অবিরত রক্তপাত।
একসময় যে মুসলিম উম্মাহর হুংকারে পরাশক্তিগুলো কেঁপে উঠতো, আজ তাদেরই রক্ত পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

খিলাফত হারানোর সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও রক্তক্ষয়ী পরিণতি হলো মুসলমানদের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের চিরন্তন বন্ধনটি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া। সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলমানদের সীসা-ঢালা প্রাচীরের মতো ঐক্যকে ধ্বংস করতে লুজান চুক্তির পর পুরো মুসলিম ভূখণ্ডকে কৃত্রিম ভৌগোলিক সীমারেখায় বিভক্ত করে দেয়। তারা উম্মাহর বৈশ্বিক চেতনার স্থলে 'জাতীয়তাবাদ'-এর বিষবৃক্ষ রোপণ করে দেয়, যার ফলে আজ এক দেশের মুসলিম নির্যাতিত হলে অন্য দেশের মুসলিমরা কেবল ভৌগোলিক সীমানা ও আন্তর্জাতিক আইনের দোহাই দিয়ে নীরব দর্শক হয়ে থাকে।

ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে কাশ্মীর, সিরিয়া বা আরাকান, সর্বত্রই আজ মুসলমানদের আর্তনাদ। মুসলমানদের রক্তে মাটিকে রঞ্জিত করা সত্ত্বেও একটি কেন্দ্রীয় খেলাফত বা খলিফার অনুপস্থিতির কারণে আজ পুরো বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিম মিলেও জালিমের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছে না।

একটি কেন্দ্রীয় ও ঐক্যবদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্রের অভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে নিজেদের ইচ্ছেমতো ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছে এবং পুতুল শাসকদের বসিয়ে মুসলমানদের অমূল্য খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ অবাধে লুণ্ঠন করছে।

অভিভাবকহীন এই উম্মাহ আজ জালিমদের প্রতিরোধ করার বদলে পশ্চিমাদের তৈরি করা আন্তর্জাতিক তাগুতী সংস্থাগুলোর কাছে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার ও করুণা ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে।

রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরাজয়ের চেয়েও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক পরাজয়।

ইসলামী হুকুমতের পাহারাদারি না থাকায় মুসলিম সমাজগুলো আজ পশ্চিমা সংস্কৃতির অবাধ চারণভূমিতে পরিণত হয়েছে।

শিরক, কুফর, বেহায়াপনা এবং অশ্লীলতা এমনভাবে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আজ মুসলিম তরুণ প্রজন্ম নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস ভুলে পশ্চিমা জীবনাদর্শের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছে।

শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে গণমাধ্যম, সবখানেই ধর্মনিরপেক্ষতার বিষবাষ্প অত্যন্ত সুকৌশলে প্রবেশ করানো হয়েছে। এর ফলে মুসলমানদের ঈমানি চেতনা এবং জিহাদের মতো পবিত্র ধারণাগুলোকে সমাজ থেকে মুছে ফেলে তাদের একটি মেরুদণ্ডহীন ও আপসকামী জাতিতে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা চলছে।

শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন ছাড়া কোনো সমাজের জীবনে প্রকৃত ইনসাফ ও প্রশান্তি আসতে পারে না।
আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়তে দেওয়া দণ্ডবিধি (হুদুদ), কিসাস এবং নিখুঁত বিচারব্যবস্থা পুরোপুরি স্থগিত হয়ে আছে।

তার পরিবর্তে আজ সর্বত্র মানব-রচিত কুফরি আইন ও সংবিধান প্রবর্তন করা হয়েছে, যা সমাজকে নৈতিক অবক্ষয়, জুলুম ও পাপাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে।

পাশাপাশি, ইসলামী অর্থব্যবস্থা বা যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির অভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আজ বিশ্বমোড়লদের তৈরি করা আন্তর্জাতিক সুদভিত্তিক অর্থনীতির দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সুদী অর্থনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে মুসলমানদের বিপুল সম্পদ গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকছে।

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, খিলাফত হারানোর ফলে ইসলামকে আজ তার পূর্ণাঙ্গ রূপ থেকে বিচ্যুত করে কেবল ব্যক্তিগত আচার-অনুষ্ঠান ও মসজিদের চার দেয়ালে বন্দি একটি ‘ধর্ম’ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

ইসলাম যে একটি বিজয়ী ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা জীবনের প্রতিটি স্তরে , রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে বাস্তবায়িত হওয়ার দাবি রাখে, এবং এটি রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার একমাত্র বৈধ বিধান, এই বৈপ্লবিক চেতনাটিই মুসলমানদের মনস্তত্ত্ব থেকে সুকৌশলে মুছে দেওয়া হয়েছে।

নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্যের চেয়ে মার্কিন বা পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর দরবারে ধরনা দেওয়াকে বেশি কার্যকর মনে করে, যা তাদের ঈমানী হীনম্মন্যতার চরম বহিঃপ্রকাশ।

খিলাফতবিহীন এই এক শতাব্দীর ইতিহাস এই দুর্বিষহ ও অবমাননাকর অবস্থা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক সুস্পষ্ট সতর্কবার্তা। যতক্ষণ না মুসলমানরা পুনরায় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধহয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার আপসহীন মানহাজে ফিরে আসবে, এবং পশ্চিমা রচিত জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ সীমানা ভেঙে সীসা-ঢালা প্রাচীরের মতো এক উম্মাহ হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই লাঞ্ছনা, পরাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই।

বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট:

বর্তমান বিশ্বে 'গণতন্ত্র' কেবল একটি রাজনৈতিক শাসনপদ্ধতি হিসেবে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি বিশ্বব্যাপী এক নতুন বৈশ্বিক আদর্শ বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পশ্চিমা পরাশক্তিগুলো এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমগুলো এমন একটি ন্যারেটিভ তৈরি করেছে যে, গণতন্ত্রই হলো আধুনিক সভ্যতার চূড়ান্ত মানদণ্ড এবং মানবাধিকারের একমাত্র রক্ষাকবচ।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান বিশ্বের এই গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি মূলত তাওহীদ বা একত্ববাদের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক।
গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ', অর্থাৎ জনগণ বা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই ভালো-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ নির্ধারণ করার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।

যার ফলে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আল্লাহর অকাট্য বিধানগুলোকে প্রতিনিয়ত বাতিল করা হচ্ছে এবং সুদ, মদ, সমকামিতা বা অবাধ যৌনাচারের মতো স্পষ্ট হারাম বিষয়গুলোকে আইনি বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। এটি মূলত আল্লাহর রুবুবিয়্যাত বা নিরঙ্কুশ শাসনক্ষমতার জায়গায় মানুষকে বসানোর এক সুপরিকল্পিত বৈশ্বিক শিরক।

বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর এক আধুনিক ও মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব মানবতা, মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার আড়ালে মুসলিম দেশগুলোতে যে গণতন্ত্র রফতানি করছে;তার মূল উদ্দেশ্য সেখানকার মানুষের মুক্তি নয়; বরং তাদের অমূল্য সম্পদ লুণ্ঠন করা এবং নিজেদের অনুগত পুতুল শাসক বসিয়ে নব্য-উপনিবেশিক আধিপত্য বজায় রাখা।

বর্তমান বিশ্বের গণতান্ত্রিক পরাশক্তিগুলোর চরম কপটতা তখন নগ্নভাবে ফুটে ওঠে, যখন কোনো মুসলিম দেশে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হয়।

আলজেরিয়ায় 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট'-এর বিজয়, ফিলিস্তিনে হামাসের জয় কিংবা মিশরে ড. মুহাম্মাদ মুরসির নির্বাচিত সরকার—প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, পশ্চিমা বিশ্ব তাদের নিজেদের শেখানো গণতান্ত্রিক রায়কেই নির্মমভাবে গলা টিপে হত্যা করেছে। তারা সামরিক স্বৈরশাসকদের সমর্থন দিয়ে লাখ লাখ মুসলিমকে হত্যা ও বন্দি করার পথ সুগম করেছে।

যার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তা ধর্মনিরপেক্ষতা, পশ্চিমা স্বার্থ ও তাগুতী বিশ্বব্যবস্থার অনুকূলে কাজ করে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের আরেকটি ভয়াবহ দিক হলো পুঁজিবাদের সাথে এর নাড়ির সম্পর্ক। আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এখন গুটিকয়েক পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে।

কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে কর্পোরেট মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনগণের মনস্তত্ত্ব এবং রায়কে নিজেদের ইচ্ছেমতো কিনে নেওয়া হচ্ছে।
এই ব্যবস্থায় সাধারণ জনতার কোনো প্রকৃত ক্ষমতা বা স্বাধীনতা নেই; বরং এটি ক্ষমতাশীল প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সুকৌশলী আধুনিক দাসপ্রথা মাত্র।

পাশাপাশি, গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে যে লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়েছে, তা বিশ্বজুড়ে এক চরম নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্ম দিয়েছে। কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় গণতান্ত্রিক সমাজগুলো আজ ভোগবাদ, অশ্লীলতা, পরিবার প্রথার ভাঙন এবং চরম আত্মকেন্দ্রিকতায় নিমজ্জিত হয়েছে, যা ইসলামকে সমাজ থেকে মুছে ফেলারই একটি সফল প্রকল্প।

পরিশেষে, বর্তমান বিশ্বের এই বৈশ্বিক গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট মুসলিম উম্মাহর জন্য এক চরম বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঈমানী পরীক্ষার সময়। পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শনের চাকচিক্য ও আন্তর্জাতিক মিডিয়ার প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে অনেক মুসলমান আজ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, হয়তো এই মানব-রচিত ব্যবস্থার সাথে আপস করেই ইসলামের বিজয় সম্ভব।

কিন্তু ইতিহাস ও বাস্তবতার নির্মমতা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করছে যে, কুফরি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই তাগুতী ব্যবস্থা কখনোই মজলুম মানবতার মুক্তি বা আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে পারবে না। আধুনিক বিশ্বের এই গণতান্ত্রিক মায়াজাল ও আধিপত্য থেকে উম্মাহর মুক্তির একমাত্র উপায় হলো পশ্চিমা আদর্শের দাসত্ব ছিন্ন করে পুনরায় শরিয়ত ও খেলাফতের আপসহীন মানহাজের দিকে ফিরে আসা এবং সমস্ত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আল্লাহর জমিনে কেবল আল্লাহরই আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট :

বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটও ইসলামী রাজনৈতিক দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং চরম অবক্ষয়ের এক বাস্তব দৃষ্টান্ত।

একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও, বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলত ধর্মনিরপেক্ষতা ও পশ্চিমা তাগুতী মতাদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

এদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে 'সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ', এই কুফরি মূলনীতিকে গ্রহণ করা হয়েছে, যা সরাসরি তাওহীদের পরিপন্থী।

কারণ, ইসলামে আইন প্রণয়ন ও চূড়ান্ত ফয়সালার একমাত্র মালিক মহান আল্লাহ। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এদেশের সংসদেও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আল্লাহর অকাট্য বিধানগুলোকে পাশ কাটিয়ে মানব-রচিত আইন প্রণয়ন করা হয় এবং সুদ, মদ ও অশ্লীলতার মতো হারাম বিষয়গুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দেওয়া হয়।

এই ব্যবস্থা এদেশের মুসলমানদের মনস্তত্ত্ব থেকে ইসলামী শাসনব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষাকে সুকৌশলে মুছে ফেলে তাদের একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর দাসে পরিণত করেছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনি সংস্কৃতির দিকে তাকালে গণতন্ত্রের সবচেয়ে কুৎসিত ও জঘন্য রূপটি ফুটে ওঠে। এখানে নির্বাচন মানেই হলো কালো টাকার ছড়াছড়ি, পেশিশক্তির মহড়া, গীবত, অপবাদ এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার নোংরা প্রতিযোগিতা।

ইসলামে যেখানে নেতৃত্ব বা পদের প্রতি লালায়িত হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে এদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ভোটারদের মাঝে অবৈধ অর্থ বা সাময়িক সুবিধার লোভ দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করা হয়।

সৎ, যোগ্য এবং তাকওয়াবান নেতৃত্বের পরিবর্তে এই ব্যবস্থায় তারাই জয়ী হয়, যাদের পেশিশক্তি, দুর্নীতি করার ক্ষমতা এবং মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কালো টাকা রয়েছে।

সাধারণ জনগণকে কেবল পাঁচ বছর পর পর একটি ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ধোঁকা দেওয়া হয়, যা কার্যত ক্ষমতাধর শ্রেণি ও দুর্নীতিবাজদের দীর্ঘস্থায়ী শাসনকেই টিকিয়ে রাখে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটের আরেকটি অন্ধকার দিক হলো বিদেশি পরাশক্তিগুলোর নগ্ন হস্তক্ষেপ এবং নির্লজ্জ দাসত্ব। বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার মসনদে বসার জন্য নিজেদের দেশের জনগণের ওপর আস্থা রাখার চেয়ে দিল্লি বা ওয়াশিংটনের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর আশীর্বাদ লাভ করাকেই বেশি জরুরি মনে করে।

নির্বাচন এলেই এদেশের রাজনীতিকদের বিদেশি দূতাবাসগুলোতে ধরনা দেওয়ার যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়, তা মুসলিম উম্মাহর আত্মমর্যাদা ও স্বাধীন চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের দালাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং 'ভাগ করো ও শাসন করো' নীতির মাধ্যমে এদেশের মুসলমানদেরকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত করে তাদের মাঝে চিরস্থায়ী শত্রুতা ও সংঘাতের বীজ বপন করে দিয়েছে। ফলে সীসা-ঢালা প্রাচীরের মতো যে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সমাজ হওয়ার কথা ছিল, তা আজ রাজনৈতিক দলাদলির বিষবাষ্পে খণ্ড-বিখণ্ড।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নামক জালে ব্যবস্থা আবদ্ধ হয়ে এদেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোও চরম আদর্শিক বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। ক্ষমতায় যাওয়ার মোহ এবং ভোটের রাজনীতি করতে গিয়ে তারা 'আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা' বা কেবল আল্লাহর জন্য মৈত্রী ও শত্রুতার মূলনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। সংসদে কয়েকটি আসন পাওয়ার

আশায় তারা অনেক সময় চরম ইসলামবিদ্বেষী, ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থী দলগুলোর সাথেও রাজনৈতিক জোট ও আপস করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসাতে গিয়ে তারা ইসলামের আপসহীন বিধানগুলো যেমন, পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত, হুদুদ, কিসাস বা সুদভিত্তিক অর্থনীতি বাতিলের কথা বলা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। এর ফলে ইসলাম তার বৈপ্লবিক স্বকীয়তা হারিয়ে একটি আপসকামী ও মেরুদণ্ডহীন দর্শনে পরিণত হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের চোখে বাতিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই উল্টো বৈধতা দান করছে।

পরিশেষে, বাংলাদেশের বিগত কয়েক দশকের গণতান্ত্রিক ইতিহাস এটিই প্রমাণ করে যে, মানব-রচিত এই তাগুতী ব্যবস্থা এদেশের মানুষের জীবনে কোনো প্রকৃত শান্তি, ইনসাফ বা মুক্তি আনতে পারেনি; বরং এটি কেবল দুর্নীতি, জুলুম, সামাজিক অবক্ষয় এবং পুঁজিপতিদের শোষণের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

তাছাড়া ২০২৬ এর নির্বাচনের দিকে তাকালেই আমরা ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি। জুলাই যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ বিফলে গিয়েছে। পরিশেষে পশ্চিমারা তাদের পুতুল শাসক বসিয়ে তাদের আধিপত্য বজায় রাখছে। মাঝখান থেকে শুধু দেশপ্রেমী, দেশরত্ন গুলো চিরতরে হারিয়ে গেলো।

পশ্চিমা গণতন্ত্রের এই মরীচিকার পেছনে ছুটে এদেশের মুসলমানরা কেবল তাদের ঈমানী চেতনাই হারায়নি, বরং ইসলামী হুকুমত কায়েমের মূল লক্ষ্য থেকেও যোজন যোজন দূরে সরে গেছে।

তাই এদেশের মজলুম মানুষের প্রকৃত মুক্তি কেবল রাজনৈতিক নেতা বা দল পরিবর্তনের মাঝে নিহিত নয়, বরং তাগুতী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে শরিয়ত নির্দেশিত শাসন ও আপসহীন ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের সর্বাত্মক সংগ্রাম গড়ে তোলার মাঝেই নিহিত রয়েছে।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রচেষ্টা :

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম। ইসলাম কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে, তার নীতিমালাও নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে বিধর্মীদের প্রণীত ব্যবস্থার মাঝে সমাধান খোঁজা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য পথে চলে, তাহলে সে গোমরাহি ও মন্দ পরিণামের পথে কদম বাড়ালো।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাবো, যেদিক সে অবলম্বন, করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কত নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান।" ৭০

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁর আনীত বিধিবিধান ছাড়া অন্য কোনো মতবাদ গ্রহণ করা।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন বলেন-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى أَيْ وَمَنْ سَلَكَ غَيْرَ طَرِيقِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَارَ فِي شِقٍّ، وَالشَّرْعُ في شِقٍّ، وَذَلِكَ عَنْ عَمْدٍ منه بعد ما ظَهَرَ لَهُ الحَقُّ وَتَبَيَّنَ لَهُ وَاتَّضَحَ له.

অর্থাৎ "সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে.."- এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনীত শরীয়ত ছাড়া অন্য কোনো পথ ধরলো। অতঃপর সে গেলো একদিকে আর শরীয়ত রইলো

আরেকদিকে। আর এটা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন তার নিকট হক স্পষ্ট ও প্রকাশিত হওয়ার পরও সে ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিরোধিতা করবে।

অর্থাৎ অনৈসলামিক পন্থায় ইসলাম কিভাবে আসতে পারে! সে তো শুরুতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পন্থা থেকে সরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচণের রাস্তা গ্রহণ করেছে। আর যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের রাস্তা গ্রহণ করেছে, দুনিয়া ও আখেরাতে কে তাকে সফলতা দান করতে পারে।

বর্তমানে সমাজের মধ্যে একশ্রেণীর লোক প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারার সাথে মিলেমিশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কাজ করছেন বলে দাবি করে থাকেন।

আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং তা বাস্তবায়ন করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে।

আবার অপরদিকে বর্তমান পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও একটি জীবনব্যবস্থা। তাও বাস্তবায়ন করার নিজস্ব পদ্ধতি আছে। একটি জীবন ব্যবস্থার পদ্ধতি দ্বারা পৃথিবীতে কখনো আরেকটি জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

যারা বর্তমানে গণতন্ত্রের ব্যবস্থার অপসারণ করে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে চান, তারা যদি এই ব্যবস্থার মধ্যেই ঢুকে পড়েন, তাহলে তা অপসারণ কিভাবে করবেন।

মূলত এর দ্বারা তারা হয়তো নিজেদের অজান্তেই অনৈসলামিক ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে - যে গাছ উপড়ে ফেলতে চান, তারা যদি সে গাছের ডালে উঠে বসে থাকেন; তাহলে গাছটি আদৌ উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে কি?

সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের পদ্ধতি নিতে হবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী থেকে। তিনি যেভাবে কাজ করছেন, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

একশ্রেণীর ইসলামী রাজনীতিবিদদের ধারণা, গণতান্ত্রিক দেশে একবারে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা খুব দুরূহ ব্যাপার। তার চেয়ে যতটুকু পারা যায়, ততটুকুই আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রয়োগ করা মানে হচ্ছে, সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটানো, যা কুরআনে সম্পর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে।

অনেকে মনে করেন যে, প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে মিলেমিশে আস্তে আস্তে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে হবে। একসাথে দ্বীনের হুকুম আহকামগুলোর বাস্তবায়ন এখন সম্ভব নয়।

তারা যুক্তি হিসেবে যেগুলো বলে থাকেন,

১.পবিত্র কুরআনও তো পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে।

২.অনুরূপভাবে মদও পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ হয়েছে।

৩.আবার কখনো বলেন যে, যেহেতু একইসাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়, তাই যতটুকু পারা যায়, ততটুকুই করতে হবে। একদম না পারার চেয়ে কিছুটা পারা অন্তত ভালো।

উপরোক্ত যুক্তি কখনোই শরীয়াহসম্মত নয়।

ব্যাখ্যা

যারা মনে করুন যে, ইসলাম এখন একসাথে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তারা নিজেদের অজান্তে এটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, ইসলাম বর্তমানে একটি অবাস্তব দ্বীন, যা একসাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

১. এই ধারণা আকীদাগত দিক থেকেই সঠিক নয়।

২. যারা বলেন, কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে, তাদের বুঝতে হবে যে, কুরআনের আয়াতসমূহ কোনো অবস্থা বা সমস্যার প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান হিসেবে নাযিল হয়েছে এবং কুরআনের কোনো আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, তখন তা সাথে সাথে পুরোপুরিভাবে পালন করা হয়েছে। নাযিল হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে পালন করার কোনো সুযোগ ছিলো না।

৩. ইসলাম বিজয়ী হওয়ার পর আর কখনো কোনো ব্যক্তি, কোনো মতবাদ বা কোনো সভ্যতার সামনে মাথা নত করবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীসে এর স্পষ্ট ঘোষণা এসেছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.

অর্থ: "যে কেউ এমন কোন আমল করে যা আমাদের তরীকা মতো হয়নি, তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৯০)

যারা মনে করেন, আমরা তো গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার 'জন্যে গণতন্ত্র করছি না; বরং এর মাধ্যমে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, দীন ও শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা।
মূলত তাদের এমন অদ্ভুত চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সাওয়াবের অধিকারী হওয়ার আশা নফসের ধোঁকা এবং শয়তান তাদের মন্দ কর্মকে তাদের সামনে সুসজ্জিত করে পেশ করার ফলে হয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

"আমরা তো এ সকল মূর্তির পূজা এজন্যই করি যে, এসকল মূর্তি আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী ও নৈকট্যশীল বানিয়ে দেবে।"৮

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে বলেন-

فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية فهو باطل

“অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ আমল, যা ইখলাসের সাথে ও শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী না হবে, তা বাতিল বলে বিবেচিত হবে।” ৬৯

যে সকল লোকেরা এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে তারা তো মুখলিস; তারা এ কারণে সওয়াবের অধিকারী হবে।

শয়তান তাদের মন্দ কর্মকে তাদের সামনে সুসজ্জিত করে পেশ করার ফলে তারা খুবই সাধারণ একটি ব্যাপার বুঝতে পারছে না।

তা হলো, ভালো উদ্দেশ্যে এখলাসের সাথে কোন কাজ করলেই যদি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হতো, তাহলে কাফেরদের মূর্তি পূজাকে কেনো কুফরী বলা হয়?

অথচ কাফিরদের মতে তারা এগুলো দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করারই চেষ্টা করতো। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তারা মূর্তিপূজা করতো।

তারা বলে,

هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

অর্থ: "এ সকল মূর্তিগুলি আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনূস, আয়াত ১৮)

তারা আরো বলে,

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

অর্থ: "আমরা তো এ সকল (মূর্তিদের) পূজা এজন্যই করি যে, এসকল মূর্তিরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী বানিয়ে দিবে।” (সূরা যুমার, আয়াত ৯২)

তারা মূর্তিপূজা এ জন্যই করতো যে, এদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্যশীল হবে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কাজকে কুফুরী বলে সাব্যস্ত করেছেন।

এই বিষয়টি হতে বোঝা যায় যে, কোনো কাজ ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো কাজ হয় না অর্থাৎ নেকের কাজ বলা যায় না, যতক্ষণ না তাতে দু'টি বিষয় পাওয়া যায়।

১) শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি তার উদ্দেশ্য হতে হবে।

২) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের তরীকা অনুযায়ী হতে হবে।

ফুযাইল বিন আয়ায রহ. বলেন,

العمل الحسن هو اخلصه و اصوبه قالوا يا ابا علي ما اخلصه واصوبه؟ قال ان العمل اذا كان خالصاولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا وبم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان الله والصواب ما كان على السنة جهود علماء الحنفية في (ابطال عقائد القبورية

অর্থ: "নেক আমল হলো ইখলাসসহ সঠিক পদ্ধতিতে যা করা হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আবু আলী! এই ইখলাসওয়ালা সঠিক আমল কিভাবে হবে?”

ফুযাইল বিন আয়ায রহ. বললেন,

“নিঃসন্দেহে আমল যদি খালেস হয়; কিন্তু সঠিক না হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য হয় না। যদি সঠিক হয়; কিন্তু এখলাসওয়ালা না হয়, তাহলে তাও কবুল হয় না। এখলাসওয়ালা

আমল হলো তা, যা শুধু আল্লাহর জন্য হয় এবং সঠিক আমল হলো তা যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক হয়।"
(জুহুদু উলামাউল হানাফিয়্যাহ ফি ইবতালি আক্কায়িদিল কুবুরিয়্যাহ, ৪র্থ অধ্যায়)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.

অর্থ: "যে কেউ এমন কোন আমল করে যা আমাদের তরীকা মতো হয়নি, তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৯০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

অর্থ: "অতঃপর আমি তারা যে আমল করেছে তার প্রতি মনোনিবেশ করবো। অতঃপর তাকে উড়ন্ত বালির ন্যায় বানিয়ে দিব।" (সূরা ফুরক্বান, আয়াত ২৩)

হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন,

فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية، فهو باطل.

অর্থ: "প্রত্যেক ঐ আমল যা এখলাসের সাথে এবং শরয়ী নিয়ম অনুযায়ী না হবে তা বাতিল।”

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ .عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً .تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ

অর্থ: "সেই দিন অনেক মুখ-মন্ডল অবনত হবে, ক্লিষ্ট-ক্লান্ত হবে, জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে, তাদেরকে গরম ঝরণা থেকে পান করানো হবে।" (সূরা গাশিয়া, আয়াত ২-৫)

এই আয়াতগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, অনেক লোক দুনিয়াতে এমন কাজ করে যা তারা সওয়াবের কাজ মনে করে করে। তাদের অবস্থা হলো তারা দিবা রাত্রি এক করে স্বীয় কাজে শ্রম ব্যয় করে।"

যেহেতু তারা তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের অনুসৃত পন্থা অনুযায়ী করে না তাই তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

অর্থ: "বলুন! আমি কি তোমাদিগকে সংবাদ দিবো কর্মে বেশী ক্ষতিগ্রস্থদের অথচ তারা মনে করে যে তারা সৎকর্মই করছে।" (সূরা কাহাফ, আয়াত ১০০)

এমনিভাবে সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

অর্থ: "ঐ সকল মুনাফিকরা; যার নিজেদের ফায়সালা গায়রুল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী করে তাদের কর্মের কারণে যখন তাদের ওপর কোন মুসীবত আসে তখন তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলেঃ 'আমাদের উদ্দেশ্য তো ছিল কল্যাণ ও সমঝোতা।" (সূরা নিসা, আয়াত ৬২)

ইমাম শাওকানী রহ. বলেন,

“মুনাফিকদের বক্তব্য ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারো নিকট বিচার-ফায়সালা নিয়ে যাওয়ার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য খারাপ নয়, ভালো ছিলো এবং বিবাদমান দু'পক্ষের মাঝে সন্ধি করা উদ্দেশ্য ছিলো। রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ উদ্দেশ্য ছিল না।” (ফাতহুল কাদীর)

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অসারতা ও প্রায়োগিক বাস্তবতা:

১. নামায প্রতিষ্ঠা বনাম সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোহ:

ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো নামায প্রতিষ্ঠা করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

"আমি তাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকর্মের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে..." (সূরা হজ: ৪১)

হাদিসের আলোকে

সহীহ মুসলিমে আওফ বিন মালেক (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"قِيلَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ :لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ..."

সাহাবীরা বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তরবারি দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করব না? তিনি বললেন: না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম রাখে।"

বাস্তব উদাহরণ:

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের মাত্র ২% মানুষ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে। এই বাস্তবতায় গণতান্ত্রিক পন্থায় নামায কায়েমের পক্ষে ভোট আশা করা আকাশকুসুম কল্পনা।
ভাগ্যক্রমে কোনো ইসলামী দল ক্ষমতায় এলেও পরের নির্বাচনে ভরাডুবির ভয়ে তারা বেনামাজির শাস্তির বিধান করবে না।

অনেকে ভাবেন সংসদে ১৫১টি সিট পেলেই ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাবে; অথচ শতভাগ মানুষ নামায পড়লেও বেনামাজির রাষ্ট্রীয় শাস্তির বিধান না থাকলে তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র হয় না।

২. ইসলাম বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের এক সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের শিক্ষা দেয়। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমা শক্তিগুলোর (যেমন আমেরিকা ও ব্রিটেন) এঁকে দেওয়া ভৌগোলিক সীমানার কারণে মুসলিম উম্মাহ আজ খণ্ড-বিখণ্ড।

মুসলমানদের এই বিশ্বজনীন ঐক্য আজ 'জাতীয়তাবাদ'-এর সংকীর্ণ গণ্ডিতে বন্দি হয়ে পড়েছে। যেহেতু গণতন্ত্র মূলত একটি নির্দিষ্ট দেশের সীমানা ও জাতীয়তাবাদের ওপরইনির্ভরশীল, তাই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দিয়ে কখনোই ভৌগোলিক সীমানার দেয়াল ভেঙে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে এক করা বা সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

৩. মুরতাদের শাস্তি বাস্তবায়নে অপারগতা:

ইসলাম ত্যাগকারী মুরতাদের ব্যাপারে ইসলামে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"যে ব্যক্তি দীনে ইসলাম পরিবর্তন করবে, তাকে কতল করো।" (সহীহ বুখারী: ৩০১৭)

বাস্তব উদাহরণ:

যারা বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধ্বংস করতে কোটি কোটি ডলার খরচ করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করছে, তারা কখনোই আপনাকে এই আইন বাস্তবায়ন করতে দেবে না।

৪. **জিযিয়া আদায় ও মার্কিন দূতাবাসের তোষণ:**

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, খলিফা ইহুদি-খ্রিস্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায় করবেন।

আল্লাহ বলেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" (সূরা বাকারা: ১৯৩)

বাস্তব উদাহরণ:

যারা কারণে-অকারণে মার্কিন দূতাবাসে ধরনা দেয়, তারা কি এই কুফফারদের থেকে জিযিয়া আদায়ের সাহস দেখাতে পারবে? কুফফারদের ফর্মুলা অনুসরণ করে তাদের স্বার্থবিরোধী আইনের স্বপ্ন দেখা নিছক বিভ্রান্তি।

৫. বহুদলীয় ব্যবস্থা বনাম ইসলামী শাসন:

ইসলামে দলাদলি বা 'সরকারি দল' ও 'বিরোধী দল'-এর কোনো স্থান নেই; এক আমীরের অধীনে পুরো উম্মাহ পরিচালিত হবে। ইসলামী রাষ্ট্র বামপন্থী, সেক্যুলার বা জাতীয়তাবাদী সকল বাতিল মতবাদকে নিষিদ্ধ করবে।

বাস্তব উদাহরণ:

জনগণের কাছে ভোট ভিক্ষা করে ক্ষমতায় এসে কোনো ইসলামী দল কি তাদের ভোটারদের প্রিয় নাস্তিক-বুদ্ধিজীবী বা সাহিত্যিকদের বিচার করার নৈতিক শক্তি পাবে?

বহুদলীয় গণতন্ত্রকে স্বীকার করে রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করতে গেলে পশ্চিমারাই বা বসে বসে আঙুল চুষবে কেন?

৬. হারাম বর্জন বনাম জনপ্রিয়তার মোহ:

একটি ইসলামী রাষ্ট্র সকল প্রকার বেপর্দা, সহশিক্ষা, সিনেমা হল, নাইটক্লাব, মদের বার, ডিজে পার্টি, বাদ্যযন্ত্র এবং মূর্তি-ভাস্কর্য নিষিদ্ধ করবে। বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম (প্রস্তরাঘাত) করবে।

বাস্তব উদাহরণ:

গণতন্ত্রে ক্ষমতায় যেতে হলে জনপ্রিয়তা খুঁজতে হয়। আর জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসালে নিজের মাঝেই ইসলাম থাকে না।

আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন:

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ...

"আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে দেবে..." (সূরা আনআম: ১১৬)

প্রকৃত বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে দেখবে।" (সূরা নাসর: ১-২)

৭. সুদভিত্তিক অর্থনীতি ও পুঁজিপতিদের আধিপত্য:

যাকাত ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে সুদভিত্তিক অর্থনীতি উৎখাত করতে গেলে ভোগবাদী ধনী শ্রেণি আপনাকে সর্বাত্মক বাধা দেবে। কারণ এই পুঁজিপতিরাই বর্তমান গণতন্ত্রের কলকাঠি নাড়ে।

বাস্তব উদাহরণ:

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর যুগে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, তাহলে বর্তমান যুগের পুঁজিপতিদের কথা বলাই বাহুল্য।

৮. জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ ও পশ্চিমা ফাঁদ :

গণতন্ত্রবাদীদের প্রস্তুতি কেবল পোস্টারিং আর দেয়াল লিখন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ

"তোমরা কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে।" (সূরা আনফাল: ৬০)

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً

"কাফিররা কামনা করে, যেন তোমরা অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাব সম্পর্কে অসতর্ক ও উদাসীন হও..." (সূরা নিসা: ১০২)

হাদিসের আলোকে

রাসূল ﷺ বলেছেন:

"فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ..."

"...এতদসত্ত্বেও তোমাদের কেউ যেন তিরন্দাযী ভুলে না বসে।" (সহীহ মুসলিম)

বাস্তব উদাহরণ:

মিশর বা আলজেরিয়ার মতো পরিস্থিতি মোকাবেলায় গণতন্ত্রবাদীদের কোনো প্রস্তুতি নেই। একজন বিশেষজ্ঞ আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "গণতন্ত্র এমন এক ধর্ম, যা বুলেটের আঘাতে বুক ঝাঁঝরা করে দিলেও তোমাকে সর্বোচ্চ রাস্তায় গিয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়ানোর অধিকার দেয়, আর তাতেই তুমি পরিতৃপ্ত হয়ে যাও।"

৯. পশ্চিমা 'মডারেট ইসলাম'-এর ফাঁদ:

আমেরিকার র‍্যান্ড ইনস্টিটিউশন মডারেট মুসলিমদের জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, পাশ্চাত্য ধাচে গণতন্ত্র গ্রহণ করা এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইন মেনে নেওয়া।

বাস্তব উদাহরণ:

পশ্চিমারা স্পষ্ট বলেছে, মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডও তাদের কাছে যথেষ্ট নয়। যারা বিশেষ ধর্মগ্রন্থের আইন চায়, তারা পশ্চিমাদের চোখে চরমপন্থী।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারিমে আগেই সতর্ক করেছেন:

وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"ইহুদি-খ্রিস্টানরা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের দীনের অনুসরণ করবে।" (সূরা বাকারা: ১২০)

১০. বিভেদ ও অনৈক্যের বিষফোড়া (Divide & Rule) :

নির্বাচন ও গণতন্ত্র মুসলিম উম্মাহর মাঝে চরম দলাদলি, গীবত ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির জন্ম দেয়। দূর থেকে সেক্যুলার-বামপন্থীরা তা দেখে আত্ম তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে।

বাস্তব উদাহরণ:

এই বিভেদের কারণে একদলের শাইখুল হাদিসের বিপরীতে অপর দলের দাড়িবিহীন তরুণ দাঁড়ায়। বাংলাদেশে ইসলামী ঐক্যের নামে গঠিত জোটের সংখ্যাই চার-পাঁচটি, যা এই ব্যবস্থার চরম ভঙ্গুরতার প্রমাণ।

১১.সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও নির্বাচনের প্রহসন:

বর্তমানে নির্বাচন মানেই বিদেশি প্রভাবের ওপেন সিক্রেট। দিল্লি-ওয়াশিংটন থেকেই নির্ধারিত হয় আগামী ৫ বছর কারা প্রক্সি দালাল হিসেবে কাজ করবে।

বাস্তব উদাহরণসমূহ:

রাজতন্ত্রবাদী সৌদির সাথে আমেরিকার গভীর সম্পর্ক প্রমাণ করে, তাদের গণতন্ত্র নয়, বরং আধিপত্য ও গোলামি দরকার।

◑ **১৯২৪** সালে লুজেন চুক্তির পর ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন দম্ভ করে বলেছিল, "তুরস্ক ধ্বংস হয়ে গেছে... আমরা তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি খিলাফত ও ইসলামকে ধ্বংস করে দিয়েছি।"

জেরুজালেম দখলের পর ব্রিটিশ জেনারেল অ্যালেনবি বলেছিল, "আজ ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল।"

◑ দামেস্ক দখলের পর ফরাসি জেনারেল গরো সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর কবরে লাথি মেরে বলেছিল, "ওঠো সালাহউদ্দীন, আমরা আবার ফিরে এসেছি!"

◑ ইসলামী শাসন কায়েম ও ফিলিস্তিনকে সাহায্য করার অপরাধে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, বাদশা ফয়সাল এবং ১৯৪৮ সালে ইমাম হাসান আল বান্নাকে পশ্চিমাদের সুকৌশলী ষড়যন্ত্রে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিল।

১২.নির্বাচনি সংস্কৃতির নৈতিক অবক্ষয় ও পদলোভ:
নির্বাচন মানেই টাকার ছড়াছড়ি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং গীবত।

বাস্তব উদাহরণ:

ভোটারদের মনোরঞ্জনে নর্তকী আনা হয়, পান-বিড়ি থেকে শুরু করে মদ-গাঁজা ও নগদ টাকা দিয়ে ভোট কেনা হয়। একজন প্রকৃত ইসলামপন্থী এই হারাম স্রোতে গা ভাসাতে পারে না। তদুপরি, ইসলামে নেতৃত্ব চাওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী ﷺ বলেছেন:

إِنَّا لَا نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

"আমরা এরূপ ব্যক্তিকে কোনো পদে মনোনীত করি না, যে তার প্রার্থী হয় বা পদের প্রতি লালায়িত হয়।" (সহীহ বুখারী)

১৩. কুফরি সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ :

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদে প্রবেশ করার পূর্বশর্ত হলো, দেশের প্রচলিত মানব-রচিত সংবিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের শপথ নেওয়া।
ইসলামী দলগুলোর নির্বাচিত সদস্যদেরও এমন সংবিধানে হাত রেখে শপথ নিতে হয়, যেখানে লেখা থাকে "সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ"।

একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কোনো কুফরি বিধান বা সংবিধান রক্ষার শপথ নেওয়া সুস্পষ্ট শিরক। যে ব্যবস্থার শুরুই হয় শিরক ও কুফরি শপথের মাধ্যমে, তার দ্বারা তাওহীদ বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা চরম অজ্ঞতা।

১৪. দারুন নাদওয়ার প্রস্তাব বনাম নবীদের আপসহীন মানহাজ:

মক্কার কুরাইশরা তাদের পার্লামেন্ট 'দারুন নাদওয়া'-তে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কার সর্বোচ্চ ক্ষমতা, রাজত্ব ও ধন-সম্পদের প্রস্তাব দিয়েছিল, বিনিময়ে তারা কেবল মূর্তিপূজার সমালোচনা বন্ধ করতে বলেছিল।

নবীজি ﷺ চাইলে সেই ক্ষমতা গ্রহণ করে পরে 'পর্যায়ক্রমে' ইসলাম কায়েম করতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই কুফরি শর্তে ক্ষমতা নেওয়াকে চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

নবীদের মানহাজ হলো শিকড় থেকে শিরক উৎপাটন করা, বাতিল কাঠামোর ভেতরে ঢুকে আপস করা নয়।

১৫. সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিক্তিতে সত্য-মিথ্যার বিচার:

ইসলামে সত্য ও মিথ্যার মাপকাঠি হলো কুরআন এবং সুন্নাহ, মানুষের মতামত নয়। কিন্তু গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রায়ই হলো চূড়ান্ত।

সংসদে যদি অধিকাংশ সদস্য মদ বা সমকামিতাকে বৈধ বলে ভোট দেয়, গণতন্ত্র তাকে আইনি বৈধতা দেয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভ্রান্তি সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

"তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে।" (সূরা ইউসুফ: ১০৬)

যে ব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আল্লাহর হারামকে হালাল করার ধৃষ্টতা দেখায়, তা দিয়ে দ্বীন কায়েম অসম্ভব।

১৬. আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা (মৈত্রী ও শত্রুতা) নীতির চরম লঙ্ঘন :

ইসলামের অন্যতম মৌলিক আকিদা হলো আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা; অর্থাৎ কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করা।
কিন্তু গণতন্ত্রে ক্ষমতায় যাওয়ার বা জোট গঠনের স্বার্থে ইসলামী দলগুলোকে চরম নাস্তিক, সেক্যুলার এবং ইসলামবিদ্বেষী দলগুলোর সাথে রাজনৈতিক জোট ও বন্ধুত্ব করতে হয়।

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআনুল কারিমের সুস্পষ্টভাবে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদি ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু।" (সূরা মায়িদা: ৫১)
ভোটের রাজনীতি মুসলিমদের এই ঈমানী মানদণ্ড ধ্বংস করে দিয়েছে।

১৭. 'মন্দের ভালো' বা মাসলাহার নামে অপব্যাখ্যা:

গণতন্ত্রে অংশগ্রহণকারীরা প্রায়শই 'মন্দের ভালো' বা 'বৃহত্তর স্বার্থ' (মাসলাহা)-এর দোহাই দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। তারা যুক্তি দেয় যে, আমরা না গেলে খারাপ লোক ক্ষমতায় যাবে।

শরিয়তের উসুল হলো কোনো স্পষ্ট কুফর বা শিরকে লিপ্ত হওয়া কখনোই 'মন্দের ভালো' হতে পারে না। একটি হারাম কাজ দিয়ে আরেকটি হারাম কাজ ঠেকানো যায় না। কুফরি পদ্ধতিতে দ্বীন কায়েমের চেষ্টা মূলত শয়তানের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ধোঁকা।

১৮. আলজেরিয়া ও মিশরের ট্র্যাজেডি:

ঐতিহাসিক শিক্ষা - আলজেরিয়া এবং মিশর।
১৯৯১ সালে আলজেরিয়ায় 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট' (FIS) গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়, কিন্তু পশ্চিমা মদদপুষ্ট সেনাবাহিনী সাথে সাথে ক্ষমতা দখল করে লাখ লাখ মুসলিমকে হত্যা করে।

একইভাবে ২০১৩ সালে মিশরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মুহাম্মাদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়।

এই ইতিহাস প্রমাণ করে, গণতন্ত্র কেবল কুফফারদের একটি রিমোট কন্ট্রোল গেম। যখনই ইসলামপন্থীরা এই নিয়মে জিততে যায়, তারা বোর্ডটাই উল্টে দেয়।

১৯. জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক তাগুতী আইনের দাসত্ব :

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো জাতিসংঘের সনদ এবং আন্তর্জাতিক তাগুতী আইনের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে বাধ্য।

কোনো ইসলামী দল যদি গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতায় চলেও আসে, তবুও তারা জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদ (যা ইসলামের অনেক বিধানের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক) উপেক্ষা করে দণ্ডবিধি (হুদুদ) কায়েম করতে পারবে না। করলে তাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামরিক হামলা নেমে আসবে।

২০. নারী নেতৃত্বের বৈধতা দান ও সুন্নাহর অবমাননা:

গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও নির্বাচন কমিশনের শর্ত পূরণের জন্য ইসলামী দলগুলোকে বাধ্য হয়ে নারীদের সংসদ সদস্য বা নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হয়। ভোটের মাঠে নারীদের অবাধ বিচরণ ও পর্দা লঙ্ঘন নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট বলেছেন:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً

"যে জাতি তাদের শাসনভার কোনো নারীর হাতে অর্পণ করে, তারা কখনোই সফলকাম হবে না।" (সহীহ বুখারী: ৪৪২৫)

২১. বাতিল ব্যবস্থাকে ভেতর থেকে বৈধতা দান :

একটি কুফরি শাসনকাঠামোকে অস্বীকার করার বদলে যখন ইসলামী দলগুলো তাতে অংশগ্রহণ করে, তখন তারা সাধারণ মানুষের চোখে ওই বাতিল ব্যবস্থাকেই একটি বৈধ রূপ দেয়।

সাধারণ মুসলিমরা মনে করে, যেহেতু বড় বড় আলেমরা সংসদে যাচ্ছে, তার মানে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো সঠিক আছে। এর ফলে বাতিলকে উৎখাত করার বৈপ্লবিক স্পৃহা সমাজ থেকে চিরতরে মুছে যায়।

২২.দাওয়াত ও তরবিয়তের পরিবর্তে কেবল ভোটের রাজনীতি:

ইসলামী আন্দোলনের মূল কাজ হলো মানুষের আকিদা সংশোধন, ঈমানী তরবিয়ত এবং সমাজ সংস্কার। কিন্তু গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জড়ালে পুরো দলের ফোকাস চলে যায় কীভাবে ভোট ব্যাংক বাড়ানো যায় সেদিকে।

তখন তারা বেনামাজী, ফাসেক এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও নিজেদের দলে টানে কেবল ভোটের আশায়। সংখ্যার আধিক্য বাড়লেও ঈমানি গুণগত মান শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

২৩. জাতীয়তাবাদের কাছে উম্মাহর স্বার্থ বিসর্জন:

গণতান্ত্রিক দলগুলো কেবল নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমানার ভেতরের স্বার্থ নিয়ে চিন্তিত থাকে। সিরিয়া, ফিলিস্তিন বা কাশ্মীরের মুসলিমরা যখন নির্যাতিত হয়, তখন এই গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলো রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলেও নিজ দেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির দোহাই দিয়ে চুপ থাকে বা কেবল মৌখিক নিন্দা জানায়। গণতন্ত্র উম্মাহর ভ্রাতৃত্ববোধকে জাতীয়তাবাদের কাছে বলি দেয়।

২৪. জিহাদের অকাট্য বিধানকে বিকৃতকরণ:

পশ্চিমা বিশ্ব ও সেক্যুলার মিডিয়ার কাছে নিজেদের 'মডারেট' বা সহনশীল প্রমাণ করার হীনম্মন্যতায় এই দলগুলো ইসলামের সশস্ত্র জিহাদের ধারণাকে বিকৃত করে।

তারা জিহাদ বলতে কেবল 'নফসের জিহাদ' বা 'ব্যালট বাক্সের জিহাদ' বোঝানোর অপচেষ্টা করে।

অথচ ইসলামে জালিমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ একটি ফরয ইবাদত, যা গণতন্ত্রের মোহ ত্যাগ না করলে কখনোই পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব নয়।

২৫. **পুঁজিবাদ ও কর্পোরেট মিডিয়ার পুতুলে পরিণত হওয়া:**

বর্তমান যুগের নির্বাচন মানেই শত শত কোটি টাকার খেলা এবং মিডিয়ার প্রচারণা। যার টাকা ও মিডিয়া নেই, সে গণতন্ত্রে অচল।
বিশ্বব্যাপী এই মিডিয়া ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি ইহুদি-খ্রিস্টান ও পুঁজিবাদীদের হাতে।

একটি নিখাদ ইসলামী দলের পক্ষে হারাম টাকার পাহাড় গড়া সম্ভব নয়। ফলে তারা হয় এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে দুর্নীতিতে জড়ায়, নতুবা পুঁজিপতিদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়।

২৬. **ইসলামকে খণ্ডিত ও আপসকামী ধর্মে রূপান্তর:**

গণতন্ত্রে অংশগ্রহণকারী দলগুলো ইসলামের কেবল সেই অংশটুকুই জনগণের সামনে প্রচার করে, যা সাধারণ মানুষের কাছে শ্রুতিমধুর ও জনপ্রিয়।
তারা জিহাদ, হুদুদ, কিসাস, এবং তাগুত বর্জনের মতো কঠোর ও আপসহীন বিষয়গুলো এড়িয়ে যায়। এর ফলে ইসলাম তার স্বকীয়তা হারিয়ে একটি মেরুদণ্ডহীন ও আপসকামী ধর্মে পরিণত হয়।

২৭.**অধিকার ভিক্ষা করার হীন মানসিকতা তৈরি:**

ইসলাম এসেছে মানুষকে শাসন করতে এবং সকল বাতিল ধর্মের ওপর বিজয়ী হতে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
"আর ইজ্জত তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনদের জন্যই।" (সূরা মুনাফিকুন: ৮)

কিন্তু গণতন্ত্র মুসলিমদের এমন এক হীন মানসিকতা শিক্ষা দেয় যেখানে তারা সেক্যুলার আদালত এবং কুফরি সংসদের কাছে নিজেদের দ্বীন পালনের অধিকার 'ভিক্ষা' করে। মুমিনরা কখনো তাগুতের কাছে নিজেদের অধিকার ভিক্ষা চায় না, বরং তারা আল্লাহর সাহায্যে তা ছিনিয়ে আনে।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উম্মাহর জাগরণে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"
(সূরা আলে ইমরান: ১৯)

মুসলিম উম্মাহর জাগরণ, সম্মান পুনরুদ্ধার এবং আল্লাহর জমিনে তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করার একমাত্র মাধ্যম হলো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'। যখন কোনো জাতি আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে মানব-রচিত শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করে, তখন সমাজে ফিতনা ও জুলুমের সৃষ্টি হয়। এই ফিতনা দূর করে দ্বীন ও খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য, আল্লাহ তায়ালা কুরআন ও সুন্নাহে জিহাদকে অপরিহার্য করেছে।

ইসলামী খিলাফত ও আল্লাহর দ্বীনকে জমিনে বিজয়ী করার এবং ফিতনা-ফ্যাসাদ দূর করার একমাত্র মাধ্যম হলো 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।

জমিন থেকে সব ধরনের শিরক, কুফরী শাসন ও ফিতনা দূর করে আল্লাহর দ্বীনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিজয়ী করার মাধ্যম হলো জিহাদ।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (কিতাল) করতে থাকো, যে পর্যন্ত না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।” *(সূরা আনফাল: ৩৯)*

নামায ও রোযার মতোই দ্বীন ও ইসলামী ভূখণ্ড রক্ষার জন্য সশস্ত্র লড়াই বা কিতাল করাকে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন, তা মানুষের কাছে আপাতদৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হলেও।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

"তোমাদের ওপর কিতালকে ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর..."
(সূরা বাকারা: ২১৬)

কুরআনের আলোকে:

উম্মাহর জাগরণের প্রথম ধাপ হলো কপটতা বা মুনাফিকী থেকে মুক্ত হয়ে খাঁটি ঈমানের ওপর দাঁড়ানো। আরাম-আয়েশের জীবন ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে লড়াই করাই মুমিনের ঈমানের আসল প্রমাণ।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"তারাই প্রকৃত মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর কোনো সন্দেহে পতিত হয়নি এবং তাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। তারাই মূলত সত্যবাদী।"

(সূরা আল-হুজুরাত: ১৫)

আল্লাহ তা'আলা পরকালীন চিরস্থায়ী মুক্তির এক মহিমান্বিত ব্যবসার দিকে উম্মাহকে আহ্বান করেন, যা তাদের আত্মাকে জাগ্রত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে।"
(সূরা আস-সফ: ১০-১১)

হাদিসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা ভারী সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর রাস্তায় তোমাদের মাল ও জান দিয়ে।" (সূরা আত-তাওবাহ: ৪১)

একইভাবে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঘরে বসে থাকা এবং ময়দানে সক্রিয় থাকার মধ্যকার ব্যবধান স্পষ্ট করে বলেছেন:

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"মুমিনদের মধ্যে যারা কোনো রকম অক্ষমতা ছাড়াই (ঘরে) বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তারা কখনো সমান হতে পারে না।"
(সূরা আন-নিসা: ৯৫)

একটি উম্মাহ তখনই পরাধীন ও লাঞ্ছিত হয়, যখন তার ভেতরে 'ওয়াহন' বা দুনিয়ার প্রতি লোভ এবং মৃত্যুর প্রতি ভয় তৈরি হয়। জিহাদের চেতনা মুমিনকে মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত করে এক অপরাজেয় জাতিতে পরিণত করে।
আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উম্মাহর এই মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়ের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, একসময় শত্রুরা মুসলিমদের ওপর এমনভাবে চড়াও হবে যেমন ক্ষুধার্ত মানুষ দস্তরখানের খাবারের ওপর চড়াও হয়। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তখন সংখ্যায় কম হবো?

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাব দিলেন:

بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ...وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ .فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا الْوَهْنُ ؟ قَالَ :حُبُّ الدُّنْيَا ، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ :

"না, তোমরা তখন সংখ্যায় অনেক হবে, কিন্তু তোমরা হবে বন্যার স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়কুঠোর মতো... এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দেবেন আর তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' ঢেলে দেবেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 'ওয়াহন' কী? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" (সুনানে আবু দাউদ)

উম্মাহর লাঞ্ছনার কারণ ও মুক্তির উপায়

আজ বিশ্বজুড়ে মুসলিম উম্মাহর যে পরাধীনতা ও অপমান, তার মূল কারণ হলো জিহাদ পরিত্যাগ করে দুনিয়াবী ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কাজে মগ্ন হওয়া। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে জিহাদে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন:

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ
تَرْ حَتَّى يَنْزِعُهُ لَا ذُلًّا عَلَيْكُمْجدِينِكُمْ إِلَى عُوا

"যখন তোমরা 'ঈনা' (সূদী কারবার) করবে, বলদের লেজ ধরবে (কৃষিকাজে বুঁদ হয়ে থাকবে), ব্যবসা-বাণিজ্যে সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে; তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা তোমাদের থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত তুলে নেওয়া হবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে আসবে।" (সুনানে আবু দাউদ)

আজ বিশ্বজুড়ে মুসলিম উম্মাহর যে চরম লাঞ্ছনা, অপমান এবং পরাধীনতা, তার মূল কারণ হলো আখেরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া এবং জিহাদের এই মহান ফরযকে পরিত্যাগ করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, জিহাদ বর্জন করার কারণেই উম্মাহর ওপর লাঞ্ছনা চেপে বসবে এবং এই অপদস্থতা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো পুনরায় দ্বীনের এই হুকুমের দিকে ফিরে আসা।
আল্লাহ তায়ালা এই উম্মাহের হাত ধরে জিহাদকে এবং ইজ্জতকে ফিরিয়ে দিন, উম্মাহর জাগরণের অন্যতম উসিলা হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

পরিশেষে

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবাহানাতালা বলেছে,

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ
আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। (আল-বাকারাহ ২:১৩৮)

সার্বভৌমত্ব, আইন প্রণয়নের অধিকার এবং মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য, এই মৌলিক বিষয়গুলোর তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিতে এটি সুস্পষ্ট যে, ইসলাম এবং প্রচলিত পশ্চিমা গণতন্ত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সাংঘর্ষিক মতাদর্শ। এই থিসিসে, কোরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি ফিকহের আলোকে এই বিষয়টিই সুপ্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থার সাথে মানবসৃষ্ট গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোনো তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক আপস সম্ভব নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَام

“ ইসলামের প্রতিপক্ষ সব বিধানই বাতিল”

গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হলো "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস" এবং শাসন ও আইন প্রণয়নের নিরঙ্কুশ অধিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের হাতে ন্যস্ত। অন্যদিকে, ইসলামের অকাট্য আকিদা হলো সার্বভৌমত্ব বা 'হাকিমিয়্যাত' একমাত্র মহান আল্লাহর।

ইসলামে হালাল-হারাম নির্ধারণ এবং জীবন পরিচালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান দেওয়ার একমাত্র সত্তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহর আইনের বিপরীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামতকে চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অগ্রহণযোগ্য।

উপরিউক্ত তাত্ত্বিক ও দালিলিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সন্দেহাতীতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা একটি হারাম এবং বাতিল পদ্ধতি। একজন মুসলিমের জন্য এমন কোনো রাজনৈতিক কাঠামোকে আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়ার সুযোগ নেই, যা আল্লাহর একচ্ছত্র আধিপত্যে শরীক করে এবং শরিয়তের বিধানকে মানবসৃষ্ট আইনের অধীনস্থ করে।

সুতরাং, মুসলিম উম্মাহর চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত পশ্চিমা মতাদর্শের অন্ধ অনুকরণ থেকে বেরিয়ে এসে কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত 'খিলাফত' ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ করা।

হিদায়াত তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতেই। সুতরাং তাঁর নিকট আকুতি, এই উম্মাহর লাঞ্ছনার অবস্থা কাটিয়ে, পুনরায় ইজ্জতের পথে ফিরিয়া আনেন।
তিনি এই মেহনতকে শুধু তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই কবুল করেন এবং এর প্রতিটি শব্দকে মুসলিম উম্মাহর জন্য জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদার ওয়াসীলা বানান।

তথ্যসূত্র:

আল কুরআনুল কারিম

◑ সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ৪০

◑ সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৪৪

◑ সূরা মায়িদা,আয়াত নং ৫০

◑ সূরা আরাফ,আয়াত নং ৫৪

◑ সূরা তাওবা, আয়াত নং ৩১

হাদীস

◑ আল-ফিরদাউস বি-মাসূরিল খিতাব (দাইলামী): ৫/৪৫৫, হাদীস নং ৮৭২৭ (দারুল কুতুবিল

◑ আল মু'জামুস সগীর, তাবারানী: হাদীস নং ৭৪৯ (আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরূত)

◑ মুসনাদে আহমাদ: ৭/২০৭, হাদীস নং ৪১৪২ (মুআসসাসাকুর রিসালা, ভৈরড)

◑ সুনানে আবু দাউদ: ৪/২০০, হাদীস নং ৪৬০৭ (আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈহ্নত)

◑ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি- অনুবাদক আসিফ আদনান।

◑ ইসলাম ও গণতন্ত্র- মাওলানা আসেম ওমর।

◑ নেদায়ে তাওহীদ- আবু উমার আল মুহাজির

◑ সুনান আত-তিরমিযী: ৩০৯৫)

◑ তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/৩৬৫ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

◑ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ: ১/৯২, শহরনীতির অধ্যায় (দারুল জীল, বৈরূত)

◑ মালফুযাতে থানবী: ২৫২

◑ আকাঈদুল ইসলাম: ২৩০

◑ মাসিক সানাবিল, ৮/২৭-২৮, সংখ্যা: ১১, মে ২০১৩ ইং

◑ ফিতরী হুকুমাত, মাওলানা কারী তায়্যিব সাহেব

◑ আহসানুল ফাতাওয়া ৬/২৬